প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-২৯
প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়
মুদ্রাকর
শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : আট টাকা

অমিতাভ চৌধুরী

অকৃত্রিম অগ্রজপ্রতিমেষু

লেখকের অন্যান্য বই

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে (১ম ও ২য়)
অলৌকিক জলযান (১ম ও ২য়)
টুকুনের অসুখ
রাজা যায় বনবাসে
সুখী রাজপুত্র
রদ্দুরে জ্যোৎস্নায়
ধ্বনি প্রতিধ্বনি
নীল তিমি
নগ্ন ঈশ্বর
সমুদ্র মানুষ
তখন হেমন্তকাল
পিপাসা
একজন দৈত্য একটি লাল গোলাপ
একালের বাংলা গল্প
একটি জলের রেখা
গম্বুজে হাতের স্পর্শ
সব ফুল কিনে নাও
পৃথিবীর এক কোণে

এদেশে এসেই আমার বাবা খুব গরীব হয়ে গেলেন। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম, দেশে থাকতে আমরা এতটা গরীব ছিলাম না। বাবা মা আমাদের ক ভাই বোন সম্বল করে এদেশে পাড়ি জমালেন সত্য, কিন্তু থিতু হয়ে তাঁরা বসতে পারছিলেন না। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়—কখনো কোনো প্ল্যাটফরমে অথবা ভাঙা মন্দিরে, পরিত্যক্ত কারো আবাসে থাকতে থাকতে কিছুটা যাযাবরের মতো জীবন বয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একটা গভীর বনের ভেতর বাবা তার সঠিক আস্তানা খুঁজে বের করলেন।

আমাদের কাজ ছিল সকাল হলে জমির জঙ্গল কাটা, আগাছা সাফ করা। মানুষের নতুন ঘরবাড়ি যেমনটা হয়ে থাকে। অথবা সেই প্রাচীনকালের মতো, কোথাও জল এবং জমিতে উর্বরা শক্তি থাকলেই যেমন জনপদ গড়ে উঠত আমরাও তেমন একটা জনপদেব আদি বাসিন্দার মতো জায়গাটাতে এসে উঠেছিলাম।

দু বছর নানা জায়গায় ঘুরে ঘুবে শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় এসে থিতু হয়ে বসার আশায় বাবা খুব খুশী। বাবা বলতেন, জমি খুবই উর্বরা। রাজরাজড়ার পতিত জমি, নানা রকমের জীবজন্তুর বাস, এই সবই বোধ হয় জমিটার উর্বরা শক্তির উৎস। জমি খুব উর্বরা বলতে বাবা বোধ হয় এ-সবই বোঝাতে চাইতেন। বাবা খুব খুশী থাকলে মাঝে মাঝে বলতেন, দু ক্রোশ হেঁটে গেলে শহর, আড়াই ক্রোশের মাথায় একটা কাপড়ের মিল, বড় মাঠ পার হয়ে গেলে পুলিস ব্যারাক, জলের অভাব নেই, খাবারের অভাবও হবে না।

এত-বড় বনটা কতদূর কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কিছু বোঝার উপায় নেই। বনটার সামনে একটা বড় শস্যবিহীন মাঠ, তারপর

দিঘির মতো কালো জল টল টল করছে, একটা পুকুর এবং আমবাগান ছাড়িয়ে ব্যারাক বাড়ি। হেস্টিংসের আমলের জীর্ণ প্রাসাদ-সংলগ্ন সব বেড়া দেওয়া প্ল্যাটফরমের মতো লম্বা খুপড়ি ঘর।

জায়গাটা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত বাবার কতটা উৎসাহ থাকবে মা বুঝি টের পেত। সংশয় ছিল হয়তো আবার কোন নবর বাবার খবর পেয়ে বাবা উধাও হতে চাইবেন। জমিটার প্রশংসায় মা বেশি রা করত না। প্রায় সময় চুপচাপ শুনে যেত। কিছু বলত না। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে হয়।

হেস্টিংসের আমলের সেই পুরনো বাড়িটাতেই ছিল পুলিসের আরমারি। বিরাট গম্বুজয়ালা বাড়িটার সামনে মাঠ। সকালে বিউগিল বাজলে শ দুই রিক্রুট ফল-ইনে দাঁড়াত। তারপর পিটি প্যারেড আরম্ভ হয়ে যেত। মাঠের ভিতর রেলগাড়ির মতো সব লম্বা খুপড়ি ঘর, আমবাগানের ভেতর সেই কুঠিবাড়ি, পুকুরের টলটলে জল আর মানুষজনের সাড়াশব্দে বনটাকে বাবার কাছে মানুষের আবাসযোগ্য মনে হয়েছিল হয়তো। বাবা এখানেই শেষবারের মতো থিতু হয়ে বসতে চাইলেন।

বাবার কাছেই পরে জেনেছি এই বনভূমির পশ্চিমে রয়েছে কারবালার মাঠ। পুবে ব্যারাকবাড়ি এবং বাদশাহী সড়ক, উত্তরে রাজরাজড়ার পুরনো শ্যাওলা-ধরা প্রাসাদ। বাবা ঘুরে ঘুরে সব দেখে এসে খবর দিতেন। অথচ প্রথম দিন এখানে এসে বাবার কথায় মনে হয়েছিল আমাদের সবাইকে একটা গভীর বন দেখাতে নিয়ে এসেছেন।—এই যে বনটা দেখছ, এখানে আছে সব বিষধর সর্প। বাবার অভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তায় এলে সাধু ভাষার ব্যবহার।—বিষধর সর্প, একদা ব্যাঘ্র দেখা যেত। তরুলতা বলতে শাল, শিমুল। উত্তরে দক্ষিণে এর বিস্তার ক্রোশের ওপর। রাজ-রাজড়ার পতিত জমি বিনে পয়সায় বলতে গেলে মিলে গেল। উর্বরা জমিতে চাষাবাদ হলে তখন দেখবে এর চেহারা কত আলাদা।

বনটা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য এখনও আমার কিংবা পিলুর হয় নি। শুধু বাবা বলেছেন, বনের শেষে আছে রাজবাড়ি। পিলখানা আছে একটা। হাতি বাঁধা থাকে। একদিন তোমাদের হাতি দেখাতে নিয়ে যাব।

দেশ ছেড়ে আসার পর এই নিয়ে বাবা চারবার জায়গা বদল করলেন। কিছুদিন এখানে বসবাস করতে করতে কি কখন মনে হবে বাবার, লোটা কম্বল গুটিয়ে ফের রওনা। তার আগেই রাজবাড়িটা দেখে আসতে হবে। অনেকদিন পর আবার হাতি দেখার এই মৌকা। বাবার মাথায় দুর্বুদ্ধি গজাবার আগেই আমি এবং পিলু কাজটা সেরে ফেলব ভেবেছি।

আসলে আমাদের অন্নকষ্ট আরম্ভ হলেই বাবা এমন একটা পৃথিবী খুঁজে বেড়াতেন, যেখানে দু বেলা পেট পুরে আহার পাওয়া যায়—সদলবলে তার খোঁজে তখন শুধু রওনা হওয়া। খোঁজ খবর করবেন, দেশের লোক কে কোথায় এসে উঠেছে, কি ভাবে বেঁচে আছে। এবং কুপরামর্শ দেবার লোকের অভাব তাঁর ছিল না। সেই জায়গাটাতে যাবার আগে যা কিছু অসুবিধা ঘটাত আমার মা। মাকে সহজে তিনি বাগে আনতে পারতেন না। মা বলত, এখানেই কোথাও কিছু জোটাতে পার কিনা দ্যাখো। ঘুরে ঘুরে আর পারছি না।

বাবার কৃত বিদ্যা বলতে যজন যাজন। এবং বাবা দেশ ছেড়ে আসার আগে জমিদার বাড়িতে আমলার কাজ করতেন। পুজো আর্চা করতেন। এখানে এসে তেমন একটা উপযুক্ত কাজের সন্ধানেই আছেন। যদি কোথাও পাওয়া যায়। একবার খবর এল গুপ্তিপাড়াতে সব বনেদী মানুষের বাস। সেখানে গেলে এমন একজন সৎ ব্রাহ্মণের কিছু একটা হয়ে যাবেই। গুপ্তিপাড়াতে আমরা একটা ভাঙা মন্দিরের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বাবা খুব সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মতো চলাফেরা করলেন কিছুদিন। ঘাটে স্নানের সময় শব্দই ব্রহ্ম—

এমন জোরে জোরে স্তোত্র পাঠ করতেন যে মাঝে মাঝে মনে হত প্ল্যাটফরমে রেলগাড়ি পর্যন্ত থমকে দাঁড়িয়েছে। আর নড়তে পারছে না।

বাবার বোধ হয় আশা ছিল, ঠিক খবর পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে—লাইনবন্দি হয়ে আসবে মানুষ জন। যাবতীয় পূজা পার্বণে ডাক পড়বে মানুষটার। এমনই বোধ হয় সব মনে হত তাঁর। অথচ গাড়ি যায় ট্রেন আসে। বাবুদের সব কাজ কাম হয়ে যায়, ভাঙা মন্দিরে সাপখোপের উপদ্রব বাড়ে। বাবা তারপর রেগেমেগে কোথায় চলে যায়। আহার আমাদের কমে আসে। মন্দিরের চাতালে আমরা উপোসী মানুষ, কখন বাবা আসবে এবং না বলে না কয়ে তিনি কোথায় যে চলে যেতেন! তারপর একদিন ফিরে এসেই যেন একেবারে সদরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন—ওঠো ওঠো। সব ম্লেচ্ছর বাস। মানুষ এখানে থাকে না। গলসীতে নবর বাবা আছে। সে তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছে। গোপালদির বাবুরা ওখানে বিরাট খামার করেছে। নবর বাবা চালের আড়ত করেছে বর্ধমান শহরে। না খেয়ে আর মরতে হবে না। স্টেশনে নবর বাবার সঙ্গে ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল!

বাবার কথাবার্তা শুনে মনে হত চালের আড়তটা আসলে নবর বাবার নয়, আমার বাবার। আর অন্নকষ্ট থাকবে না। কেবল খাও আর খাও। সারাদিন—অহ সে কি স্বপ্ন! যখন তখন খেতে বসে যাব। বাবা কত সহজে সব কিছু নিজের বলে ভাবতে পারতেন। বলতেন, এত বড় আড়ত নবর বাবার—চার পাঁচটা পেটের সংস্থান হবে না সে কি হয়! এবং রওনা হবার আগে ধুমধাড়াক্কা লেগে যেত। এটা নাও ওটা নাও। কিছু পড়ে থাকল না তো। স্নান আহার করার সবুর সইত না বাবার। রওনা হতে পারলেই হল।

পিলু আর আমার তখন কাজ ছিল স্টেশনে বসে দুর্লভ হাড়ি পাতিল, ভাঙা বাক্স, ছেঁড়া শীতলপাটি পাহারা দেওয়া। চার পাশের মানুষ-

জনদের মনে হত চোর বাটবাড়। কে কি ভাবে ঠকিয়ে শীতলপাটি কিংবা ভাঙা বাক্সটা মাথায় করে ভাগবে কে জানে।

আর ট্রেনে সেই পকেটমার হইতে সাবধান—এমন সব বাক্য জোরে জোরে পড়তে আমাদের ভাল লাগত। আর তখন এই গাড়িতে কে পকেটমার নয় সেটা ঠিক করাই ছিল বড় দুরূহ কাজ। মনে হত সবাই পকেটমার। গাড়িতে সবাই সবাইকে বুঝি পকেটমার ভাবছে। আমাদের যা চেহারা এবং যা অবস্থা সহজেই সবাই পকেটমার ভেবে ফেলতে পারে। গাড়িতে উঠে ভয়ে আমরা দু ভাই কাঁচুমাচু হয়ে বসে থাকতাম। কারণ আমার আর পিলুর যা পোশাক-আশাক ওতে অন্তত চোর বাটপাড় না ভাবুক, চোর বাটপাড়ের আণ্ডা বাচ্চা ভাবতে পারে।

মার মুখ তখন আরও করুণ। একে বিনা টিকিটের যাত্রী—তার ওপর ট্রেনের গায়ে ও-সব লেখা, মা বোধ হয় ভয়ে কেঁদেই ফেলবে। এত ভয় যে বাংকে না বসে নিচে বসে পড়েছে। বিনা টিকিটের যাত্রী—কখন কোথায় নামিয়ে দেবে—তার চেয়ে নিচে বসে থাকলে কেউ কিছু বলবে না। নিচে তো আর কেউ বসে না। কারো জায়গা দখল করেও মা বসে নেই। কিছুতেই কারো কোনো অসুবিধা হোক মা চাইত না। আমরাও পাশে গোল হয়ে লটবহরের মতো গাদা মেরে পড়ে থাকতাম। বাবার অবস্থা একেবারে অন্যরকমের। যেন সংকীর্তনের দল নিয়ে বের হয়েছেন। গাঁয়ে গঞ্জে ঈশ্বরের নাম দেবে তার আবার ভাড়া কি। এবং সহজেই এত ভাল মানুষ হয়ে যেতেন তখন যে আমার মা পর্যন্ত তাজ্জব বনে যেত।

আর আমার বাবা তখন এক দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। কামরার জানলায় মুখ বাড়িয়ে কখনও কি দেখতেন। কখনও দরজায়। কোনো স্টেশনে প্ল্যাটফরমে নেমে ঘোরাঘুরি করতেন। যেন বাবার জমিদারি এটা। কার কি বলার আছে। আর চেকারবাবুকে দেখলেই মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে যেত। কিন্তু কাছে এলে একেবারে

তিনি দু পাটি দাঁত বের করে হেসে ফেলতেন। বাবার হাসি দেখলেই বোধ হয় টের পেত নির্ঘাত রিফিউজি।

বাবা তখন সব সামলেসুমলে একেবারে অন্তরঙ্গ মানুষের মতো কথা-বার্তা আরম্ভ করে দিয়েছেন চেকারবাবুর সঙ্গে। যত বাবাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে তত বাবা মনে যেন বেশি জোর পাচ্ছে। এবং সব সময় একটা লোককে স্যার স্যার করলে যা হয়, একসময় চেকার-বাবুটি যথার্থই সহৃদয় হয়ে উঠতেন। আর যেই না সামান্য সহৃদয় হয়ে ওঠা, বাবার সেই প্রথম আপ্ত বাক্যটি মুখ ফসকে বের হয়ে আসত—স্যার আপনার দেশ ছিল কোথায় ?

বাবার সাহস দেখে চেকারবাবুটি তার কাজকর্মের কথা ভুলে যেত। বোধ হয় বিরক্তও হতেন। আচ্ছা ফিচেল লোক তো। তোমার কি এত দরকার আমার দেশ বাড়ির খবরে।

আমরা নানা জায়গায় বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এই আপ্ত বাক্যটির মূল ভাবার্থ ততদিনে আবিষ্কার করে ফেলেছি। ঢাকা জেলার মানুষ আমরা। এতটা সগৌরবের জেলা বাংলাদেশে আর যেন একটাও নেই। বাবার অহংকার, ঢাকা জেলার লোক দেশবন্ধু, ঢাকা জেলার লোক বিজ্ঞানী জগদীশ বসু। আর সেই জেলার লোক বাবার ডাকসাইটে জমিদার দীনেশবাবু। এই তিন ব্যক্তি বাবাকে তার জেলা সম্পর্কে আমাদের এই দুঃসময়ে খুব অহংকারী করে রাখে মাঝে মাঝে। চেকার বাবুটাবুর সঙ্গে দেখা হলেই সেটা তাঁর যেন আরও বেশি করে মনে হয়।

বাবার বুঝি খুব ইচ্ছে হত, চেকারবাবু যদি ঢাকা জেলার লোক হন! ঢাকা জেলার লোক হলেই নিশ্চিন্তি। একই জেলার মানুষ, সুতরাং ভাই বেরাদারের মতো। এবং সেই প্রথম আপ্ত বাক্যটির পর বাবা আর কি বলবেন, তাও জানা থাকত। ঢাকা জেলার লোক হলেই বাবার পরের আপ্ত বাক্যটি হচ্ছে, দীনেশবাবুকে চেনেন ?

চেকারবাবু যদি জবাব না দিত তাতেও তাঁর কিছু আসত যেত না।

ঠিক বাবা পরের তিন নম্বর আপ্ত বাক্যটি উচ্চারণ করতেন, কি দেশ ছিল বলুন! কত বড় পাপ করলে সে দেশ ছেড়ে মানুষকে আসতে হয়! আমাদের আর কি থাকল!

চেকারবাবুটি হয়তো তাঁর একটা কথাও শুনছে না। কিন্তু বাবার কথার কামাই নেই। চার নম্বর আপ্ত বাক্যটি আবার বের হয়ে আসত।—দীনেশবাবুকে চেনেন না। ঢাকা জেলার লোক হয়ে তার নাম শোনেন নি! আমার তখন মনে হত, দীনেশবাবু হচ্ছে বাবার দেখা পৃথিবীতে সব চেয়ে সেরা মানুষ। সে মানুষটার নাম জানে না ঢাকা জেলাবাসী চেকারবাবু—কি তাজ্জব! লোকটা আসলে তখন ঢাকা জেলার কিনা বাবার সংশয় হত। তাঁর পাঁচ নম্বর আপ্ত বাক্যটি আর মুখ ফসকে বের হয়ে আসত না। কেমন দমে যেতেন একেবারে।

মুড়াপাড়া কত বড় গ্রাম—শীতলক্ষার পারে দীনেশবাবুর সেই প্রাসাদের মতো বাড়ি, দীনেশবাবুর নুন খায় নি ঢাকা জেলার মানুষ বাবার বিশ্বাস করতে কষ্ট হত। আর কি বৈভব। পূজাপার্বণে দোল দুর্গোৎসবে তিনি ছিলেন সে বাড়ির প্রাণ। দীনেশবাবু এমন মানুষ, যাঁর পরিচয়ে আমার বাবার পরিচয় মিলে যাবে। এবং বাবার মুখ দেখলেই আমরা টের পেতাম, তাঁর ছ নম্বর এবং শেষ আপ্ত বাক্যটি এবারে বের হয়ে এল বলে, আমাদের এমন দিন ছিল না মশাই, যা দেখছেন বুঝছেন আমরা তা নই।

তখনই আমার মা নড়েচড়ে বসত। বাবার এই অসহায় উক্তি এতবার মা শুনেছে যে আর সহ্য করতে পারত না। বাবার এই দীন হীন উক্তি মাকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে তুলত। এবং তখনই মনে হত বাবার ডাক পড়বে এবার।—দ্যাখ তো বিলু লোকটার সঙ্গে তোদের সেনাপতি কি এত ব্যাজর ব্যাজর করছে।

আমি উঠে গিয়ে বললাম, বাবা, তোমাকে ডাকছে।

কে ডাকছে, কেন ডাকছে বাবার সব জানা। বলতেন, যাচ্ছি যাচ্ছি।

কিন্তু যতই তিনি চড়া গলায় কথা বলুন না কেন, তাঁর আর এক দণ্ড দেরি করার সাহস থাকত না। পৃথিবীতে এখন একমাত্র যাকে সমীহ করার সে হচ্ছে আমার মা। পাশে চলে এসে বলত, ডাকছ কেন!

—কি অত ব্যাজর ব্যাজর করছ।

বাবার রক্ত বোধ হয় গরম হয়ে যেত। এবং সেই এক কথা—আরে রণ-সাজে আছি! এখন কে কোথায় কি করে বসবে তার আমরা কতটুকু জানি। সবাইকে খুশী না রাখলে চলে।

রণ-সাজে কথাটা বাবা খুব ইদানিং ব্যবহার করছেন। আর মাও বাবাকে সেই সুবাদে সেনাপতি আখ্যা দিয়েছে। এখন আর মা তোদের বাবা না বলে, বলে, তোদের সেনাপতি কোথায় গেল রে।

বাবা আবার লাফিয়ে কামরার দরজায় ছুটে গেলে মা বলল, ছাখ তোদের সেনাপতি কার সঙ্গে আবার পরামর্শ করতে গেল।

আমরা বুঝতে পারি মার ভয়টা কোথায়। এমন একটা যুদ্ধের ফ্রণ্টে বাবা বোধ হয় তাঁর স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে পারছেন না। মার ভয় সেই চেকারবাবুটির সঙ্গে পরামর্শ করে হয়তো সামনের স্টেশনেই নেমে পড়বে। নেমে পড়বে না নামিয়ে দেবে কে জানে। কোনো কিছু ঠিকঠাক নেই—কি যে হবে! কিছু বললেই রেগেমেগে বলবে, যুদ্ধক্ষেত্রে রণ-সাজে আছি। কখন কি হবে কিছু বলা যাবে না।

মার তখন আর কোনো উপায় থাকে না।—মতিভ্রংশ হয়েছে তোমার। মা খুব বেশি গালাগাল দিলে বাবাকে এমন সব নিষ্ঠুর কথা বলত।

মা কোনো উপায় না দেখে বলল, যা তো, কি বলছে শোন।

খুব সন্তর্পণে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। ট্রেন তেমনি দ্রুত আমাদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছে।

কাছে যেতেই বাবা বললেন, তোর মাকে বল সামনের স্টেশনে নামব। মার কাছে ফিরতে না ফিরতেই দেখলাম বাবাও ফিরে এসেছেন। সেই আমাদের হাড়ি পাতিল, শেতলপাটি, একটা

পেতলের কলসি, বালতি দুটো এবং জীবনধারণের যা কিছু প্রয়োজন—কারণ আমাদের সঙ্গে এমন সব মহামূল্য সামগ্রী রয়েছে যে একটা ফেলে গেলে প্রচণ্ড সর্বনাশ হবে। বাবা গুনতে থাকলেন, আমি গুনে দেখলাম। পিলু টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সব ঠিক নিয়েছে কিনা মা একবার গুনে দেখল—একটা শেষ পর্যন্ত কম পড়ে যাচ্ছে—কি গেল, খোঁজ খোঁজ—যা চোর বাটপারের দেশ, কোনটা কে নিয়ে যাবে—খুঁজে পাওয়া গেল, একটা ছেঁড়া চটের বস্তা। বাবা মহা খুশী কিছুই খোয়া যায়নি দেখে। তাঁর ছেলেরা যে ভীষণ উপযুক্ত হয়ে উঠেছে ভেবে হয়তো গানই ধরে দিতেন—কিন্তু স্টেশনে ট্রেন তখন থেমে গেছে। বাবার আর গান গাওয়া হল না। হাঁক ডাক শুরু করে দিলেন। যেন স্টেশনে নেমেই দেখতে পাবেন, নবর বাবা দাঁড়িয়ে আছে। বাবাকে মহামান্য মানুষের মতো স্টেশনে নিতে এসেছে নবর বাবা।

কেউ স্টেশনে ছিল না। বাবা স্টেশনে নেমেই খোঁজাখুঁজি করলেন। কোথায় নবর বাবা, কোথায় সেই গোপালদি বাবুদের খামার! যাত্রিরা চলে গেলে শুধু ফাঁকা প্ল্যাটফরম পড়ে থাকল। অথচ এমন একটা অচেনা নির্বান্ধব জায়গায় বাবা এতটুকু ঘাবড়ে গেলেন না। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, কোথায় আর অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি হবে। স্টেশনেই থাকার মতো ব্যবস্থা হয়ে গেল। স্টেশনের কল থেকে জল নিয়ে এল বাবা। প্ল্যাটফরমের এক পাশে ছোট মতো একটা সেডও আবিষ্কার করা গেল। সেডটা পাওয়ায় জায়গাটা ভালই মনে হচ্ছে। নবর বাবা কোথায় থাকে, নবর বাবা এবং তার ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষের পরিচয় দিয়ে দু-একজনের কাছে খোঁজ খবরও নিলেন। সবাই বাবার কথাবার্তা শুনে মাথার কোনো গোলমাল আছে ভাবল। যত বললেন, নবর বাবা শ্রীশ পাল এখানে বাড়ি করেছে, বর্ধমানে চালের আড়ত আছে তার, তত তারা বুঝে শুনে গা ঢাকা দেওয়াই শ্রেয় মনে করল। কেউ আর দাঁড়ায় না। বাবার কথা শুনলেই

পালায়। অন্ধকারে অদৃশ্য জনতার দিকে তখন বাবা হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন।

গোপালদির বাবুরা আছেন এখানে, কোনদিকটায়—তারও খোঁজখবর পাওয়া গেল না কিছু। বাবা কি বুঝে আর আমাদের কাছে আসতেও সাহস পাচ্ছিলেন না। ঠায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মার বোধ হয় মায়া হল। বলল, ডেকে আন।

ফিরে এসে খুব নম্র গলায় বাবা বললেন, ধনবৌ, আজকের মতো এখানেই রাত কাটাতে হবে দেখছি।

মার কোনো যেন এতে আর আপত্তি নেই। অথবা মার চোখমুখ দেখে বোঝা গেছিল, বিপত্তি বাড়বে বই কমবে না। শুধু বলল, শ্রীশ পাল এখানে কোথায় থাকে না জেনেই চলে এলে।

—সেই তো বর্ধমান স্টেশনে দেখা। সব বললাম। শুনে বলল, আমাদের দিকে চলে আসুন, বামুনের অভাবে পুজো পার্বণ সব ভুলে যাচ্ছি।

পিলু ইতিমধ্যে কিছু খড়কুটো সংগ্রহ করে ফেলেছে, ওর খাবার ঠিক না থাকলে মাথা গরম হয়ে যায়। বাবার ওপর ভরসা করে থাকতে সে বোধ হয় আর রাজী নয়। সে আর মায়া কিছু শুকনো প্যাকিং বাক্সের কাঠও নিয়ে এসেছে। মা তাড়াতাড়ি কাঠগুলো লুকিয়ে ফেলল। শীতলপাটি দিয়ে সেই কাঠগুলো ঢেকে রাখা হল। আর প্ল্যাটফরম পার হলে বর্ষার জল, নালা ডোবা। ডোবা থেকে পিলু অন্ধকারেই কিছু কলমি শাক তুলে এনেছে। মা সবই সযত্নে রেখে দিল। কুপি জ্বালানো হল।

বাবা ফের স্টেশনমাস্টারের কাছে হাজির হয়ে সব একেবারে খুলে বলছেন। শুনতে চায় না তবু বাবা বার বার বোঝাচ্ছিলেন, শ্রীশ পাল আমাকে কি বিপদে ফেললে বলুন তো। এখন এই ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় উঠি।

ফিরে এসে বাবা খুব মিনমিনে গলায় বললেন, বুঝলে ধনবৌ, একটা চিঠি

দিয়ে এলে ভাল হত। ও জানবে কি করে আমরা এসে বসে আছি। আমাকে তিনি বললেন, মার যা লাগে এনে টেনে দিস। আমি একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখি কে কোথায় আছে।

মা বলল, কোথাও যেতে হবে না। সকালে দেখা যাবে।

আমিও বললাম, সকালেই দেখা যাবে বাবা।

মা কোলের ভাইটাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। খুব জোরে কথা বলতে পারছে না। পারলে যেন বলত, পুনু ঘুমচ্ছে। ওকে আর জাগিয়ে দিও না। জেগে গেলেই খেতে চাইবে।

—সকালে কি আর সময় পাব। যেন কত কাজের মানুষ বাবা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছাখ বাবা কোথাও গোটা তিন চার ইট পাস কিনা। কিছু তো খেতে হবে।

মেটে হাঁড়িতে চাল আছে এখনও কিছুটা। চাল থাকলে মার অন্য দুঃখ বড় একটা বেশি থাকত না। চাল ফুটিয়ে দেওয়া যাবে। ঠিক ভাত না। ফ্যানা ভাতও নয়। সবটাই জল, কিছুটা চাল। জাউ। খুবই পাতলা। এনামেলের থালায় ঢেলে পাখার হাওয়া। আমাদের খিদে এত প্রবল থাকে যে ভাঙা পাখার শন শন শব্দ একদম সহ্য হয় না। দেরি হয়ে যাচ্ছে। যত গরমই হোক মুখে দিয়ে হাঁ করে বসে থাকা। আর প্রবল শ্বাসে তাকে ঠাণ্ডা করে নেওয়া। মুখের বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পেটে গেলে আরও ঠাণ্ডা। বাবা আমাদের খাওয়া দেখতে দেখতে বললেন, তোরা বড় হা-ভাতে। এমনভাবে খাস যেন জীবনেও ভাত খাস নি। আস্তে খা। গাল, গলা পুড়ে গেলে ডাক্তার পাব কোথায়। সময় যা যাচ্ছে।

প্ল্যাটফরম পার হয়ে যাবার সময় কাউন্টারে দেখলাম স্টেশনমাস্টার মশাই টেবিলে ঝুঁকে কি লিখছেন। একবার অফিস ঘরটার পাশে দাঁড়ালাম। দরজা খোলা। দু-তিনজন বাবু মতো মানুষ বসে গল্প করছে। টরে টক্কা শব্দ হচ্ছে। কেমন একটা আশ্চর্য স্বপ্নের মতো পৃথিবী। আমি বড় হয়ে স্টেশনমাস্টার হব ভাবলাম। এবং এটা

প্রায়ই দেখেছি, যখন কোনো মানুষ বাবাকে ধমকে কথা বলত, অথবা বাবা যাদের সমীহ করে কথা বলতেন তাদের ওপরয়ালা হবার মনে মনে বাসনা জাগত। তখন বাইরে অন্ধকার মতো একটা রাস্তায় বাবা কার সঙ্গে কথা বলছেন। কাছে যেতেই বললেন, সাবধানে থাকিস। আমি একটু ঘুরে আসছি।

রাতে আর সত্যি বাবা ফিরলেন না। আমাদের বাবা মাঝে মাঝে এ-ভাবে হারিয়ে যেত। কলমি শাক সেদ্ধ আর জাউ-ভাত খেয়ে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। অথচ বাবা নেই। মনটা ভার হয়ে গেল। অবশ্য জানি বাবা আবার ঠিক এক সময়ে ফিরে আসবেন। এ ক'দিন কিভাবে যাবে আমরা জানি না। মাও জানে না। আমাদের কথা মনে হলে, মার কথা মনে হলে বাবা কোথাও গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারেন না।

অনেক রাত এ-ভাবে তখন পরিত্যক্ত আবাসে অথবা প্ল্যাটফরমে আমাদের কেটে গেছে। আমি, পিলু, মায়া কখনো চুপচাপ প্ল্যাটফরমে বসে থাকতাম। ঘুরতাম। কখনো আকাশে জ্যোৎস্না থাকত, কখনো অন্ধকার। কিছু কুকুর বেড়াল ছিল তখন আমাদের সঙ্গী। ওরাও আমাদের সঙ্গে পায়ে পায়ে ঘুরত। বাবা আমাদের কোথায়, কতদূরে—বাবার জন্য আমাদের ভারি কষ্ট হত তখন। আমরা তবু কিছু খেয়েছি, বাবা কিছু না খেয়েই কোথায় চলে গেল। একটা মাল গাড়ি টং লিং টং লিং ঘণ্টা বাজিয়ে চলে আসত। অন্ধকারে কোনো দূরবর্তী ছায়া এগিয়ে আসতে থাকলে মনে হত বাবা বুঝি ফিরছেন। সবার আগে ছুটে যেত পিলু। পেছনে আমি। সবার শেষে মায়া। কিন্তু সে অন্য মানুষ। মাঠের অন্ধকারে মেঘলা আকাশের নিচে আমরা বাবার জন্য এভাবে অপেক্ষা করতাম। বাবা বুঝি ফিরছেন। মাথায় হাতে বাবার রকমারি পোঁটলা-পুঁটলি। ভেতরে পূজা-পার্বণের চাল-ডাল। মার জন্য লাল পেড়ে শাড়ি। হাত দিলে বলবেন, ওটা তোমার মার। ধরো না।

এতবড় পৃথিবীতে আমাদের বাবা বাদে আর কিছু নেই। মানুষের ঘরবাড়ি থাকে আমাদের তাও নেই। চুপচাপ থাকলে মায়া বলত, দাদা ছাখ, দূরে কেমন একটা নীল বাতি জ্বলছে। সিগন্যালের লাল বাতিটা গাড়ি আসবে বলে নীল হয়ে গেছে। সাইডিং-এ মালগাড়ি সান্টিং হচ্ছে। ইচ্ছে হত এঞ্জিনের ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে থাকি। সে আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে যাক। আমি তো বড় হয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে আমি নিজেও কিছু একটা করতে পারি।

॥ দুই ॥

বাবার দূর সম্পর্কের এক ভাই কাছাকাছি শহরটায় থাকে। তাঁর কাছে খবর পেয়েই এখানে চলে আসা।

ফলে আমাদের মনে হত, এতদিন আমরা অজ্ঞাতবাসে ছিলাম। এখন থেকে বনবাসের পালা। অন্তত বাবার কথাবার্তা এবং আচরণে এসবই মনে হত। বাবা কোথাও আর জায়গা পেলেন না, এখানে পাণ্ডববর্জিত একটা বনভূমিতে শেষ পর্যন্ত চলে এলেন।

ঘর বলতে বাঁশের খুঁটিতে দরমার বেড়া। টিনের চালের একটা বাছারি ঘর। আকাশ সামান্য ফর্সা হলে ঘরও ফর্সা হয়ে যায়। জ্যোৎস্না রাতে বেড়ার ফাঁকগুলো এক একটা এক এক রকমের। কোনোটা তারাবাতির মতো, কোনোটা যেন মোমবাতির শিখা। বাঁশ কেটে মাচান করে দিয়েছে বাবা। লম্বা মাচান। খলফা ফেলে মাচানকে সমতল করা হয়েছে। মা, পিলু, মায়া, পুন্নু বড় মাচানটায় শোয়। ছোটটা আমার আর বাবার। দুটো ছেঁড়া মশারি। কত-কালের পুরনো বাবাও বলতে পারবেন না। রং একেবারে কালো—

ধুলো ময়লা লাগলে নতুন করে টের পাবার উপায় নেই। তালি মারা এত যে আসল মশারিটা কবেই উবে গেছে।

সকালে ঘুম ভাঙলে দেখলাম বাবা পাশে নেই। বোধ হয় রাত থাকতেই উঠে পড়েছেন। মানুষের ঘরবাড়ির বুঝি আলাদা একটা গন্ধ থাকে। সকাল না হতেই বাবা গন্ধটা পান। তখন আর বিছানায় থাকতে পারেন না। এত শীতেও কাবু হন না বাবা। এত ঠাণ্ডা যে কাঁথার ভেতর হাত পা জমে যায়। টিনের চাল বলে ঠাণ্ডাটা আরও বেশি। দরমার বেড়ার ফাঁকে হা হা করে শীত ঢুকে যায়। লেপ কাঁথা সব বরফ। বাবা পাশে শুয়ে থাকলে বেশ গরম থাকে। উঠে গেলেই শীতটা যেন আমাকে একলা পেয়ে বেশ জেঁকে বসে।

সূর্য ওঠার আগে বাবা তার ঘরবাড়ির সীমানাটা প্রতিদিনের মতো একবার ঘুরে ঘুরে দেখবেন। বেশ চিন্তাশীল মানুষের মতো তখন তাঁকে হাঁটতে দেখা যায়। পাঁচ মাসে বিঘে পাঁচেক জমির বেশ কিছুটা সাফ করা হয়ে গেছে। শীতের সময় বলে হিম পড়ে থাকে ঘাস পাতায়। কোথাও শুকনো কাটা জঙ্গল, কোথাও আগুনে ডালপালা পোড়ে নি বলে আধপোড়া ঘাসপাতা। সব মাড়িয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাবেন বাবা। কোন দিকটায় হাত দেওয়া দরকার, কোনদিকে হাত লাগালে তাড়াতাড়ি সাফ হবার কথা—সব ভেবে ভেবে দেখা। তারপর যেমন পালংয়ের জমি, পেঁয়াজের জমি, সীমের মাচান, লাউয়ের মাচান, কোথাও সামান্য জমিতে মূলো চাষ, সব জমিতে বীজ বপনের পর কার কতটা বাড়বাড়ন্ত প্রতিদিন সকালে না দেখতে পেলে যেন তাঁর ভাল লাগে না। এ-সময়টুকু এইসব হাতে বোনা ফসলের সঙ্গে থাকতে পারলে যেন বেঁচে যায় মানুষটা। আয়ু বাড়ে তাঁর।

আর মনে হত বাবা সারারাতই জেগে থাকেন সকাল হবার আশায়। কতক্ষণে সকাল হবে। যে গাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে, অথবা যে লতায় ফুল আসবে, কখন কার কি পরিচর্যার দরকার রাতে শুয়ে

শুয়ে কেবল বুঝি ভাবেন। তখন কোথাও দাঁড়িয়ে কোথাও বসে অতি সন্তর্পণে সব কিছু ঠিকঠাক করে দিতে দিতে দেখতে পান সকাল হয়ে গেছে। পাখিরা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অন্য আকাশে। ঘরবাড়ি মিলে বাবার সকালটা আমাদের চেয়ে কেমন অন্য রকমের মনে হয় তখন।

বিছানায় শুয়ে বাবার গলা শুনতে পাই—উঠে পড় সবাই। সূর্য উঠে গেছে আর বিছানায় থাকতে নেই।

পুব আকাশটা সামান্য ফর্সা হলেই বাবা সূর্য ওঠার কথা বলতেন। তখন আমাদের কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে হত না। কাঁথা গায়ে শুয়ে থাকার ভেতর ভারি আরাম। কুঁকড়ে শুয়ে থাকি। চোখে রাজ্যের ঘুম। বাবা চায় তাঁর সঙ্গে আমিও এই সব চাষ আবাদ ঘুরে ফিরে দেখি।

এ-ভাবে বুঝতে পারি বাড়িটার চারপাশে ধীরে ধীরে সব শস্যক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। খুব সকালে মাও বোধ হয় শস্যের গন্ধ পায়। আর শুয়ে থাকতে পারে না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে পড়ে।

এখানে আসার পর বাবা কিছু পেঁপে গাছ লাগিয়েছেন। কোথা থেকে নিয়ে এসেছেন দুটো চাঁপা কলার গাছ। বড় যত্ন সহকারে গাছ দুটো জমির একপাশে লাগিয়েছেন। এত সব দেখেই বোধ হয় মা বাবাকে আবার নির্ভরশীল মানুষ ভাবতে পারছে। কথায় কথায় বাবাকে সেনাপতি বলে আর ঠাট্টা করে না।

এবং দেখা গেল, বাবা কিছু কলাপাতা এনে মায়াকে বললেন, অ আ লেখ। আমাকে বললেন, তোর বইগুলো বের কর, মানুর কাছে যা। পরীক্ষাটা দিতে হয়।

পরীক্ষাটা দিতে হয়, যেন অনেকদিন পর কথাটা বাবার মনে পড়ে গেল। দেশ ছেড়ে আসার পর গত দু'বছর কথাটা আমার এবং বাবার কারো মনে ছিল না। জমিজমা এবং মানুষের ঘরবাড়ি হয়ে গেলেই বুঝি কথাটা মনে হয়। পিলুকে বাবা কিছুতেই

পড়াতে বসাতে পারলেন না। তা ছাড়া পিলু খুব একটা আজকাল ভয়ও পায় না। অভাবী মানুষের সন্তানেরা বুঝি একটু বেশি বেয়াড়া হয়। পিলু যে বের হয়ে গেল, বাবা পিলুকে কিছু বলতে পর্যন্ত সাহস পেলেন না। পিলু এখন সিক্স-সেভেনে পড়তে পারত। দুটো বছর বাবার সঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে ওর স্বভাবটাও কিছুটা বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে। অবশ্য ঠিক বাউণ্ডুলে না বলে বরং বলা যায় পিলু মার দুঃখ অথবা অভাববোধটা বোধ হয় আমার চেয়ে বেশি টের পায়। সে যতটা পারে মার জন্য বাবার জন্য কাজ করে বেড়ায়। কেউ তাকে আর ঘাঁটায় না। দেখা গেল পিলু আসছে, হাতে পায়ে কাদা মাখা—কোচড়ে সব পুঁটি ট্যাংরা মাছ। কোনো গর্ত থেকে সব ধরে এনেছে। হয়তো দেখা গেল পিলু মাথায় করে নিয়ে আসছে এক ঝুড়ি গোবর। কখনো কোঁচড়ে গিমা শাক। সে বাড়িতে বাবার মতো ইতিমধ্যেই আংশিক সংসারী মানুষ হয়ে উঠছে।

বাবা একদিন ভারি আশ্চর্য একটা খবর নিয়ে এল। বনটার শেষ প্রান্তে কেউ ঠিক আমাদের মতো মানুষের ঘরবাড়ি গড়ে তুলছে। বাবা সারাটা সকাল তাদের বাড়িতেই ছিলেন এবং কতদিন পর একজন প্রতিবেশী পাওয়া গেল ভেবে বোধ হয় বাড়ির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এসে সারাটা দিন, নিবারণ দাস আর নিবারণ দাস। তার দুই বউ। বড় সংসার। বাদশাহী সড়কের ধারে বনের একটা অংশ কিনে ফেলেছে। বাবা এখানটায় তার ঘরবাড়ি করে যে ভুল করেন নি নিবারণ দাসের মতো বিচক্ষণ লোকের আগমনের সংবাদ দিয়ে সেটা বার বার মাকে বোঝাতে চাইলেন। বিচক্ষণ কে বেশি, যে আগে করল, না যে পরে।

বিকেলে ঠিক বাবার বয়সী সেই লোকটা আমাদের বাড়িতে এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিল, ঠাকুর কর্তা আছেন। বাবা তাড়াতাড়ি জঙ্গল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হলেন। জঙ্গলের ঝোপঝাড় কাটছিলেন বলে মাথায় মুখে ঘাসপাতা লেগে ছিল। নিবারণ দাস

এসেছেন, নিবারণ দাস, খোঁজ-খবর করতে এসেছেন—বারে বা—দেশ ছেড়ে আসার পর বাবার জীবনে কত বড় ঘটনা, বোধ হয় আর ইহজীবনে এত বড় ঘটনা ঘটেছে বাবার জীবনে নিবারণ দাসের আসা দেখে, আদর আপ্যায়ন দেখে আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। বাবা তাকে তামাক খাওয়ালেন, এবং এমন একটা জায়গা বসবাসের জন্য নির্বাচন করেছে বলে তাকে কত যে সাধুবাদ দিলেন। লোকটা মাকে কর্তা মা কর্তা মা করছিল। মাও বেজায় খুশী, আর লোকটির কথাবার্তা হাবভাব অদ্ভুত আপনজনের মতো। যেন এই ব্রাহ্মণ পরিবারের কথা শুনেই এখানে চলে আসা। সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে গঙ্গা পারে আসা। পালা পার্বণে যদি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তবে বেঁচে থাকার আনন্দ থাকে না। এমন কি দুজনে বসে ঠিকও করে ফেলল, আগামী শনিবারে শনিপূজা করবে নিবারণ দাস। বাবার একজন যজমান পাওয়া গেল তবে।

লোকটা চলে যাওয়ার পর বাবা কিছুক্ষণ কেমন ধন্দ লাগা মানুষের মতো বসে থাকলেন। লাখ টাকা লটারি পেয়েছে শুনলে দুঃখী মানুষের মুখে যেমন রা সরে না বাবারও বুঝি তেমন কিছু হয়েছে। বসে আছেন তো আছেনই। আমাদের ভয় ধরে গেল। ডাকলাম, বাবা! মা বলল, হ্যাঁগো তুমি কি ভাবছ অত।

বাবা কেমন সুদূরের মানুষ হয়ে গেছেন। খুব ধীরে ধীরে বললেন, ভাবছি মানুষের বাড়িঘরের কথা।

বাবার এই ধরনের আত্মদর্শন ঘটলেই কেমন আমাদের সব গোলমাল ঠেকে। কাছে বসে বললাম, লোকটা সত্যি শনিপূজা করবে তো বাবা! মাও বলল, হ্যাঁগো, সত্যি করবে তো! এত সুখ শেষ পর্যন্ত কপালে সইবে তো!

বাবা কেমন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ করবে। একবার যখন বলে গেছে তখন দ্যাখ মিথ্যে হবে না।

আর আমার মনে হল, বাবা কাল সকালেই চলে যাবেন—কি দাস মশাই পূজা তা হলে হচ্ছে। আর যদি না হয়, তবে বাবা না আবার ভিরমি খেয়ে পড়ে যায়। কে দেখবে তখন! ভয়ে ভয়ে বললাম, আমি কাল তোমার সঙ্গে যাব।

—কোথায় যাবি ?

— নিবারণ দাসের বাড়ি।

—কেন ?

তোমার কি হবে-না-হবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারলাম না। বললাম শুধু, দেশের মানুষ এসেছে, ঘরবাড়ি করছে, দেখে আসব।

বাবা খুব ভারিক্কি গলায় বললেন, শনিপূজার দিন নিয়ে যাব।

শনিবারের জন্য আমাদের তখন কি আকুলি-বিকুলি! মাও শনিপূজা একটা না করলে হয় না এমন বায়না ধরলে বাবা বললেন, হবে হবে। সবই তো হয়ে যাচ্ছে। কোনটা বাকি থাকছে। আগে একটা পঞ্জিকা কিনি। পঞ্জিকা না হলে পুরুত মানুষের মান-সম্মান থাকে না।

শনিবারের আশায় পিলু পর্যন্ত সুবোধ বালক হয়ে গেল।

শনিবার সত্যি এসে গেল। বাবা বেশ বিকেলেই আমাদের নিয়ে রওনা হলেন। কতকাল পর আমরা আবার সম্মানিত মানুষ। আমাদের জামা প্যান্ট খারে কাচা হয়েছে। কালীর পুকুরে মা সারা দুপুর আমাদের ছেঁড়া তালিমারা যা জামাকাপড় ছিল সব ধুয়ে ঘাসের ওপর শুকোতে দিয়েছে।

আমরা যাচ্ছিলাম। রাস্তাটা বেশ মনোরম লাগছিল। কখনও এদিকটায় আসা হয় নি। বাবার গায়ে নামাবলি। মা সঙ্গে থাকলে একেবারে সপরিবারে শনিপূজা সেরে আসা হত। দু-একবার বাবা যে বলে নি তা নয়। কিন্তু নিবারণ দাস বিশেষ কিছু বলে যায় নি বলে আত্মসম্মানে মার লেগেছে। বোধ হয় সে-জন্যই আসে নি। তবে মা বলেছে, আমি গেলে বাড়িটা খালি থাকবে না।

শনিপূজার দিন বাবা বেশ বিকেল থাকতেই আমাদের নিয়ে রওনা হলেন। আমরা আমাদের তালিমারা ছেঁড়া জামা প্যান্ট পরে রওনা হয়েছি। মা চুলে কাকুই দিয়ে দিয়েছে। ভুরুর ওপরে একটু কাজলের ফোঁটা। মার এতদিন পর মনে হয়েছে তাঁর সন্তানেরা ভারি সুন্দর দেখতে। এবং চারপাশে যা বনজঙ্গল, আর ভূত প্রেত কখন কার নজর লেগে যাবে ভয়ে মা মাথায় একটু থুথু দিয়ে বা পায়ের গোড়ালী থেকে সামান্য ধুলো মাখিয়ে দিয়েছে মাথায়। যতই রাত হোক, যতই অপদেবতার ভয় থাকুক, আমরা তার বাইরে। মা কত সহজে আমাদের সব বিপদ থেকে যে রক্ষা করে থাকেন।

ব্যারাকবাড়িতে তখন প্যারেডের হুইসিল বাজছে। এখন প্যারেড না থাকলে বাবা বোধ হয় ঘুরে ব্যারেকের পথটা ধরে যেতেন। বাবা যে কত বড় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সন্তান এটা বোঝাবার এমন একটা মৌকা হাতছাড়া হয়ে গেল বলে বোধ হয় মনে মনে এখন আপসোস করছেন। ক'মাস হয়ে গেল, তবু পুলিসের কোয়ার্টার-গুলোতে পূজা পার্বণে বাবার একদিনও ডাক পড়ে নি। দেশ ছেড়ে সবাই এদেশে এসে মুচি মেথর সব ঘোষ বোস বনে যাচ্ছে। বাবা যে তেমন একজন কেউ নয় কে জানে। বাবা কিছুতেই বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারছিলেন না। নামাবলী গায়ে খালি পায়ে শনিপূজা সারতে যাচ্ছেন বাবা, যেন হাবিলদার সুবেদারের সঙ্গে দেখা হলেই বলা, যাচ্ছি শনিপূজা করতে। নিবারণ দাস শনিপূজা করছে। এসে হাতে পায়ে ধরল, কি আর করা যায়, শনিঠাকুর বলে কথা! কিন্তু প্যারেডের সময় কে আর কাকে লক্ষ্য করে! বাবা অগত্যা যেন বনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

রাস্তাটা বেশ মনোরম লাগছিল। কখনও এদিকটায় আমি আসিনি। দু-পাশে বড় বড় শিরীষ গাছ, তার ছায়া, এবং লতাপাতায় ঢাকা আশ্চর্য সব বনঝোপ। আমাদের পায়ের শব্দে পাখিরা উড়ে গেল ঝোপ থেকে। এবং কোথাও সুন্দর কুরচি ফুল ফুটে আছে। নাকে

সুবাস এসে লাগছে। একটা পায়ে হাঁটা পথ এঁকে বেঁকে কতদূরে যে চলে গেছে মনে হয়।

বাবা অনেকটা আগে চলে গেছে। গায়ে নামাবলী। একটা ছোট বাঁকের মাথায় বাবা অদৃশ্য হয়ে যেতেই কেমন ভয় ধরে গেল। ডাকলাম, বাবা। পিলু বলল, আমি ঠিক চিনি। তুই আয়। মায়া বাবার নাগাল পাবার জন্য দৌড়চ্ছিল। আমি পিলু বাবাকে ধরার জন্য তারপর দুজনেই একসঙ্গে ছুট লাগালাম। বাবাকে আমাদের খুব এখন ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। পিলু পর্যন্ত বাবার কথা শুনছে। সে বাবার নাগাল কিছুতেই ছাড়ছে না। আমার গায়ে হাফসার্ট। পা খালি আমাদের সবার। বেশ উঁচু নিচু পথ। দু'পাশের সব ঝোপ জঙ্গল রাস্তা ঢেকে রেখেছে। কিছুটা প্রায় লাফিয়ে যেতে হচ্ছে কখনো। মনে হল পিলু এ-সব অঞ্চলে ঘুরে গেছে। সে-ই সব খবর দিচ্ছিল আমাকে। বলল, ডান দিকে ঐ যে দেখছিস, দেখতে পাচ্ছিস না দাদা, বড় বড় দুটো বাঁশঝাড়, ওপাশে গেলে একটা পোড়ো বাড়ি আছে। তারপর আছে তোর কারবালা, পরে মাঠ, রেললাইন। কারবালায় তোকে একদিন নিয়ে যাব। ইটের ভাটা আছে একটা। নবমী বলে একটা বুড়ি থাকে। কচু আর বনআলু সেদ্ধ করে খায়। কোনো দুঃখ নেই। লোক দেখলেই ফোকলা দাঁতে হাসে, ওমা তুমি কেগা! সুমার বনে একা ঘুরে বেড়াচ্ছ!

আমার ভাল লাগল না। পিলুর বেজায় সাহস। কোনো বনের ভেতর বুড়ি থাকলে ডাইনী বুড়ি না হয়ে যায় না। বুড়িটা যদি পিলুকে ছাগল ভেড়া বানিয়ে রাখে!

পিলু বলেছিল, জানিস দাদা, বুড়িটার দুটো বড় ছাগল আছে। কত বড় শিং। ভাবলাম মাকে বলব, মা, বুড়িটা দেখবে পিলুকে বাঁদর বানিয়ে রেখে দেবে।

—কত তুকতাক জানতে পারে।



পিলু হাসত। বলত, তুই খুব ভীতু স্বভাবের। আমরা হেঁটেই যাচ্ছি; রাস্তা আর শেষ হচ্ছে না। বন বাদাড়ের রাস্তা বুঝি কখনও শেষ হতে চায় না। সূর্য আর দেখা যাচ্ছে না। এত ঘন গাছপালা যে মাথার ওপরে আকাশ আছে বোঝা যাচ্ছিল না। দিনের বেলাতেই গা ছমছম করছে। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। কেমন ভয় লাগছিল। রাতে আমরা ফিরব কি করে। যদিও বুঝতে পারছিলাম এ-সব বলা যায় না। বাবা খুব গুরুগম্ভীর গলায় বলবেন, তুমি বামুনের ছেলে। তোমার তো ভয় থাকার কথা নয়। বাবার কিছু দৃঢ় বিশ্বাস আছে। যেমন সব ভূত প্রেতের কথায় এলে বাবা অনায়াসে বলবে, বামুনের বাচ্চা, কেউটের বাচ্চা এক। সবাই ভয় পায়।

পিলু বাবার কাছাকাছি হাঁটছে। মায়া মাঝখানে। সবার শেষে আমি। মাঝে মাঝে আমি কতদূরে আছি বাবা ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল।

বাবার ডান হাত ধরে রেখেছে মায়া। সে পুজোর সব খেয়ে নেবে বলছে। পেট ভরে সিন্নি খাবে, মুড়ি খাবে, নারকেল বাতাসা খাবে, যেন এমন অতীব এক ভোজন কতকাল পরে প্রায় উৎসবের মতো এসে গেছে।

আমি জানি, বাবা, আজ ভারি তন্ময় হয়ে যাবে পুজোয় বসে। বেশ নিয়ম নিষ্ঠা, যা দেখলে নিবারণ দাস আখেরে আর সাহসই পাবে না, পুজো পার্বণে অন্য বামুনের কথা ভাবতে। একেবারে বাবা যেন আত্মীয়ের মতো অথবা পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ, পূজার সুফল কি, কেন এইসব পালাপার্বণ, হিন্দু ধর্ম, তার দেবদেবীর কি মাহাত্ম্য এবং পাঁচালী পড়লে গেরস্থ মানুষের যা কিছু ফললাভ বাবা ব্যাখ্যা করে যাবে।

পিলু বলল তখন, দাদা যাবি?

—কোথায়?

—কারবালাতে।

—আমার ভয় করে।

—ভয় কি রে!

—ওখানে মুসলমানদের কবরখানা আছে।

—তাতে কি!

—কত সব মানুষের কঙ্কাল!

—তুই দেখেছিস?

—দেখব কি করে?

—তবে! শেষে সে অভয় দেবার মতো বলল, একটাও থাকে না। শেয়ালেরা সব খেয়ে নেয়। সে একবার একটা শেয়ালকে মাঠের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। প্রায়, যা বর্ণনা পিলুর, বাঘ-টাঘের সামিল। সে কিছুদূর পর্যন্ত শেয়ালটার পেছনে দৌড়েছিল। এবং বনের ভেতর ঢুকে যেতেই ভারি একা মনে হয়েছিল নিজেকে। আর বোধ হয় ভয় ভয়ও করছিল। দাদা সঙ্গে থাকলে অন্তত সেটুকু থাকত না। এবং এ-জন্যই মাঝে মাঝে তোষামোদ দাদাকে—যাবি দাদা। কত রকমের সব ফলের কথা, এবং বড় বড় বন-আলু তুলে আনা যায়—এক একটা আলু পনের বিশ সের ওজনে। একবার তো সারাদিন পিলুর দেখা নেই। মা বার বার বলছিল, কোথায় যে গেল ছেলেটা। বাবার সাদাসিধে কথা। গেছে কোথাও—ঠিক চলে আসবে। সকালে পিলু কিছু না খেয়ে বের হয়ে গেছে সেদিন। মার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে। মা রেগে গিয়ে খেতে দেয় নি কিছু। রাগের মাথায় যদি একটা কিছু করে ফেলে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। মা না খেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে—আমিও কতবার ডাকাডাকি করেছি। ব্যারাকের মাঠে এবং বাদশাহী সড়কে উঠে দেখে এসেছি। নেই।

মা তখন প্রায় ভেউ ভেউ করে কেঁদেই দিত। মায়া এসে বলল, ছোড়দা আসছে। ছোড়দা মাথায় কি একটা অতিকায় বহন করে আনছে। কাছে এলে দেখতে পেলাম অতিকায় বন-আলু। প্রায়

হাতির সাদা দাঁতের মতো। মার যত রাগ, নিমেষে উবে গিয়েছিল।—এতবড় বন-আলু মা জীবনেও দেখে নি। প্রায় দু হাতে মাথা থেকে নামাতে গেলে পিলুর প্যান্ট হড় হড় করে নেমে গেল পেট থেকে। কিছু খায় নি বলে পেটটা কোথায় ঢুকে গেছে। হাতে পায়ে মুখে—শরীরের সর্বত্র মাটি কাদা এবং সেদিন ওকে পুকুর পাড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে বাংলা সাবানে শরীর পরিষ্কার করে দিয়েছিল মা। একটা আলুতে আমাদের কতদিন চলে যাবে। খেতে বসে পিলুর সাম্রাজ্য জয়ের কথা শুনতে শুনতে মা কেবল চোখের জল ফেলেছিল। বাবার মতো পিলুকে সেই থেকে কেন জানি মাঝে মাঝে আমার ভারী সমীহ করতে ইচ্ছে হত।

তখনই বাবা বলল, এসে গেছি।

বনটার শেষ। এদিকেও সেই বাদশাহী সড়ক ঘুরে গেছে। এবং বোঝাই যায় পুব-উত্তরে কিছু দক্ষিণেও বনটাকে একটা হাঁসুলির মতো এই বাদশাহী সড়ক প্রায় সবটা ঘিরে রেখেছে। ঠিক রাস্তার ধারেই দুটো দোচালা টিনের ঘর নিবারণ দাসের। পুব-দক্ষিণ খোলা বলে সকাল দুপুরের সবটা রোদই বাড়িটা পায়।

সাঁজ লেগে গেছে। আমাদের দেখে নিবারণ দাস হাত জোড় করে ছুটে আসছে। একটা জলচৌকিতে বাবাকে বসতে দেওয়া হল। বারান্দায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। খোলা উঠোনে বেশ বড় গামলায় দুধ, চালের গুঁড়ো। সাদা পাথরে ঠাণ্ডা নারকেলের জল। দাসের দুই বউ আমাদের দেখে কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ছেলে মেয়েরা পরিষ্কার জামা কাপড় পরে সেজেগুজে আছে। বড় মেয়েটা শাড়ি পরেছে। ঢপ ঢপ করে প্রণাম বাবাকে। তারপর আমাকে পিলুকে লুটের বাতাসার মতো প্রণাম করতে থাকল। আমরা কত বড় মানুষের ছেলে এই বুঝি প্রথম টের পেলাম। পিলু দেখলাম মুখ বেশ গম্ভীর করে রেখেছে। ওর জামার

নিচে প্যাণ্ট, প্যাণ্টে দড়ি পরানো নেই। পরিয়ে দিলেও থাকে না। এখন পিলু এত গম্ভীর যে মনে হয় দম বন্ধ করে আছে। দম আলগা করে দিলেই হয়েছে। প্যাণ্ট আবার হড় হড় করে নিচে নেমে না যায়। ভাগ্যিস বড় মেয়েটা একটা শতরঞ্চ পেতে বারান্দার একপাশে বসতে দিল। তাড়াতাড়ি যেন নিজের গরজেই আর মান-সম্মানের ভয়ে পিলুকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলাম। আর আমরা সবাই নিরীহ মানুষের মতো পূজার ভোগসামগ্রী সতৃষ্ণনয়নে দেখার সময় মনে হল বুড়ি মতো কেউ লাঠি ঠুকে ঠুকে এদিকটায় আসছে। হ্যারিকেন তুলে আমাদের মুখ দেখছে। ফোকলা দাঁতে বলছে, এ যে সব কার্তিক ঠাকুর এক একজন। বলেই লাঠি পাশে রেখে মাথা ঠুকতে থাকল। আমাদের তখন একেবারে হতভম্ব অবস্থা।

বাবা পদ্মাসনে বসে আছেন। আমরা তাঁর ছেলেপুলে কে দেখলে বলবে? আমরা কি করছি, কি-ভাবে আছি একবারও মুখ ফিরিয়ে দেখছেন না। কেবল পুজোর ফুল নৈবেদ্য, ঘট, আমের পল্লব, সিঁদুরের থান, তিল তুলসী সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিচ্ছেন। নিবারণ দাস বাবার পা ধুইয়ে দিয়েছে জলে। পা মুছে দিয়েছে। এত বড় মানুষটা বাবাকে এ-ভাবে সমাদর করতেই আমরা আরও নিরীহ গোবেচারা হয়ে গেলাম। বাবার মান-সম্মান এখন সব কিছুই আমাদের স্বভাব-ধর্মের ওপর নির্ভর করছে।

চারপাশে আর কোনো লোকালয় নেই। দূরে এই কিছু জমি পার হয়ে গেলে চৌমাথা। বাদশাহী সড়ক ফুঁড়ে রাস্তাটা গেছে রাজবাড়ির দিকে। চৌমাথায় বড় পাটের আড়ত।

বারান্দায় হ্যাজাকের আলো। এখানে বসেও দেখা যায় পাটের আড়তে কাজকর্ম হচ্ছে।

নিবারণ দাস বলল, পাটের আড়ত দেব ভেবেছি কর্তা। কেমন হবে?

চারপাশে বাবা ফুল চন্দন ছিটিয়ে দিচ্ছিল। বাড়িটা জুড়ে বেশ পূজা

পূজা গন্ধ। বাবা ভারি নিপুণ গলায় বললেন, লক্ষ্মী আপনার বাঁধা দাসমশাই। যাতে হাত দেবেন সোনা ফলবে। বাবার কথা অমৃত সমান ভেবেছে নিবারণ দাস।

আমার কেবল মনে হয়েছিল, আমাদের জন্য কেন বাবা এমন আশীর্বাদ ঈশ্বরের কাছে চেয়ে নেয় না। কত সহজে বাবা নিবারণ দাসকে অমৃত সমান কথা বলে দিতে পারল। আমার বাবা বেশ সুশ্রী মানুষ, লম্বা এবং গৌরবর্ণ। আর বাবা এত অভাবের ভেতরও শরীর বেশ কোমল এবং মাথা ঠিক রাখতে পেরেছে। পূজায় বাবাকে কে কি দিল—এই যে শনির পূজা, একটা বড় গামছা দিতে পারত নিবারণ দাস—কত না জানি দক্ষিণা দেবে, অথচ সে-সব বাবা আদৌ গ্রাহ্য করে না এবং বেশ সময় নিয়ে নিষ্ঠা সহকারে পূজা করে গেল। শান্তির জল দিল সবাইকে। সুর ধরে পাঁচালী পাঠ করল। সবাইকে প্রসাদ মেখে সিন্নি, চাল কলা এবং আমাদের হাতে হাতেও দিল। কাউকে বেশি না কম না। মায়া যে রাস্তায় পই পই করে বলেছে পেট ভরে সিন্নি খাব—সেসব যেন বাবা একেবারেই ভুলে গেছে। অবস্থা এমন যে শেষ পর্যন্ত বাবা তাঁর ছেলে মেয়ে বাড়ি পর্যন্ত চিনে নিয়ে যেতে পারলে হয়। এত কমে এত বেশি পুণ্য হয় না—বাবাটা যে কি! রাগে ভেতরটা গরগর করছিল।

পিলুর দিকে তাকিয়ে আরও বেশি রাগ হচ্ছিল। তুই কি রে! নিজের স্বভাব-ধর্ম মানুষ এ-ভাবে ভুলে যায়! তুই পর্যন্ত একবার বলতে পারলি না, আমাকে আর একটু দাও বাবা। তুই চাইলে বাবা দুবার আমাকেও দিত। মায়া পেট ভরে সিন্নি খাবে বলেছিল—কথাটা মনে পড়ত বাবার।

তখনই দাসের মা বলল, কর্তা, এত প্রসাদ খাবে কে?

দাসের মার কথা শুনেই আবার নড়েচড়ে বসা গেল।

বাবা বলল, আসবে। মানুষজন আসবে। এলে দেবেন, প্রসাদ নামমাত্র।

তখন ভগবানকে বললাম, হা ভগবান, মানুষের বাবা এত নিষ্ঠুর হয় ! পূজার দক্ষিণা মাত্র পনের পয়সা। পনেরটা পয়সাই তামার। পয়সা কটা বাবা আঁচলের কোণায় শক্ত করে বাঁধলেন। দুবার টেনে দেখলেন, খুলে পড়ে টড়ে যেন না যায়। গামছায় ভোজ্য দ্রব্য বলতে সামান্য চাল, দুটো নাতি-বৃহৎ বেগুন, একটা হরিতকী, ছোট ছোট লাল জরুলের মতো দুটো আলু খুব যত্নের সঙ্গে নিয়ে নিলেন। এই সামান্য পাওনার বিনিময়ে বাবা লোকটাকে কত বড় কথা বলে গেল ! বাবা যখন উঠব উঠব করছে, নিবারণ দাস বলল, এরা তো কিছুই খেল না। কর্তামার জন্য একটু এবং এই বলে সে একটা বড় জাম বাটিতে অনেকটা সিন্নি, চাল কলা ফল গামছায় বেঁধে দিল নিজে। বাবা কিছুই দেখছে না, যত কথা বলছেন দাসের সঙ্গে। আমাদের চোখ চকচক করছে। মেয়ের একটা ভাল বর খোঁজা দরকার। বাবা নিজের ওপরেই ভারটা নিয়ে নিলেন এবং এমন সব মানুষ জনের খবরাখবর দিলেন বাবা, যে নিবারণ দাস বাবাকেই এ-বিপদে একমাত্র কাণ্ডারী ভেবে ফেলল।

ফেরার পথে একটা হ্যারিকেন দিয়ে দিল। নিবারণ দাস কথা বলতে বলতে কিছুটা পথ এগিয়ে দিচ্ছিল। সিন্নি প্রসাদ নিবারণ দাসের হাতে। যে-ভাবে বাবা আর নিবারণ দাস কথাবার্তায় মসগুল হয়ে গেল, না জানি পঁটুলিটা দাসের হাতেই থেকে যায়। যা আমার একখানা বাবা, ফেরার পথে শুধু হ্যারিকেনটাই হয়তো ধরা থাকবে হাতে। পিলু বোধ হয় এটা টের পেয়ে বেশ কায়দা করে বলল, জ্যাঠা, আমাকে দিন। আমি নিচ্ছি।

জ্যাঠা বলল, পারবে তো ?

পিলু ঘাড় উঁচিয়ে বলল, খুব।

যখন কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে নিবারণ দাস টর্চ জ্বেলে চলে গেল তখন পিলু আর স্বভাব-ধর্ম ঠিক রাখতে পারল না। হাঁত ঢুকিয়ে একটা কলা বের করে বলল, দাদা খা।

আবার বের করে নিল দু টুকরো নারকেল। মায়াকে দিল, আমাকে দিল। সে নিজেও রাক্ষসের মতো সব মুখে ফেলছিল।

বাবা বললেন, বেশ তো ভাল ছেলে হয়ে ছিলে বাবারা। জঙ্গলে ঢুকতে না ঢুকতেই স্বমূর্তি ধারণ করলে বাবারা। তোমার মার জন্য কিছু রেখ!

আমরা এ-ভাবে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার হাতে হ্যারিকেন। অন্ধকার ঘোলাটে পৃথিবী ফুঁড়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আলোতে আমাদের ছায়াগুলো কখনও লম্বা কখনও ছোট হয়ে যাচ্ছিল। পিলু সবার আগে। এবং জানি মা খলপার দরজা বন্ধ করে রাস্তায় কোনো শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। মা না একা আবার ভয় পায়। আমরা তখন প্রায় দৌড়ে সেই অন্ধকার বনভূমি পার হবার চেষ্টা করছিলাম। পৃথিবীতে এ-কটা প্রাণী বাদে এই বনভূমি এবং অন্ধকারে কিছু জোনাকি পোকা—বনের মধ্যে মা নিশীথে আমরা কতক্ষণে ফিরছি সেই আশায় বসে রয়েছে। বাড়ির কাছে আসতেই পায়ে ভীষণ জোর এসে গেল। দৌড়ে দরজায় উঠে গেলাম। ডাকলাম, মা আমরা এসেছি। ওঠো। মা লম্ফ হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই বলল, তোর বাবা কোথায়?

— আসছে।

আমরা মার যেন কেউ না। বাবার জন্য লম্ফ হাতে মা উঠোনে নেমে গেল। বাবা যাতে ভাল দেখতে পায় সেজন্য লম্ফটা আরো উঁচু করে ধরল।

মনে হল মা আমার নিমেষে আকাশবাতি হয়ে গেছে। সবার ওপরে হাত। হাতে লম্ফ। লম্ফের আলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাবা আলোর দিকে এগিয়ে আসছেন। বাবাকে খুব শক্তিশালী যুবকের মতো মনে হচ্ছিল।

॥ তিন ॥

নিবারণ দাস পরদিনই সকালে এসে হাজির। একটা চাটাই পেতে দিল মায়া। মা ঘোমটা টেনে বলল, তোর বাবাকে ডেকে দে। বাবা এ-সময়টাতে কোথায় থাকেন সংসারে সবাই জানে। সীমানা বরাবর জিয়ল গাছের ডাল পুঁতে নিজের জমি ঠিক করে নিচ্ছেন। বাবা এলে দাস বলল, এলাম কর্তা। একটা দিনক্ষণ দেখে দিন। শুভদিনে আড়ত খুলব ভাবছি।

বাবা বলল, দাসমশাই, পাঁজি তো নেই।

এবং দাসমশাই পরদিনই একটা নতুন পঞ্জিকা উপহার দিয়ে গেল। দিনক্ষণ জেনে গেল। বাবা পঞ্জিকাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভারি অভিভূত হয়ে বসে থাকলেন। বড় মূল্যবান সামগ্রীর মতো বইটাকে দেখতে থাকলেন। কাছে গেলে ধমকে উঠলেন, এখানে কি, যাও! পাছে কেউ বইটাতে আমরা হাত দিই ভয়ে একদম কাছে ভিড়তে দিলেন না। দূর থেকেই আমরা যতটা পারলাম আশ মিটিয়ে দেখলাম।

খুবই ভাগ্যবান মানুষ বাবা—আস্ত একটা পঞ্জিকা নিবারণ দাস উপহার দিয়ে গেল—ভাগ্যে লেখা না থাকলে এ-সব হয় না। এখানে আসার পর কতবার তো চেষ্টা করেছেন শহর থেকে বইটা আনিয়ে নেওয়ার। কিছুতেই হয়ে ওঠে নি। গত জন্মের পুণ্যফলেই এখনও যা কিছু হচ্ছে। বিশেষ করে বইটা পেয়ে বাবা কেমন খুবই ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। পাতা খুলে খুব সন্তর্পণে একের পর এক দেখে যেতে থাকলেন। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন অমূল্য ধন তাঁর কাছে আছে, আর যদি জানতে পারে মানুষেরা,

অমোঘ দিনক্ষণ বলে দিতে পারে মানুষটা তবে অঞ্চলের একজন সেরা মানুষ হতে বেশী আর সময় লাগবে না।

বইটা পেয়ে দু-তিন দিন বাবা নাওয়া খাওয়ার কথাই ভুলে গেলেন। বাড়ি ঘরের কথা মনে থাকল না। সারাটাক্ষণ উবু হয়ে গোটা পঞ্জিকাটা পড়ে বোধ হয় শেষ করে ফেললেন। কোনো পাতায় আবার দুটো লাইন দেগে দিলেন। বইটা কোথায় রাখা যাবে, এই নিয়েও বড় সমস্যা দেখা দিল। পিলুকেই বেশি ভয় বাবার। ছবি দেখতে গিয়ে ছিঁড়ে না ফেলে। মলাট দেবার মতো বাড়তি কাগজ নেই। তিনি বইটি রাখার মতো কোনো জায়গাই ঘরে নির্বাচন করতে পারলেন না। ট্রাংক ভাঙা। যে কেউ খুলতে পারে। নিবারণ দাস দিলই যখন বাড়তি একটা তালা চাবি দিলে পারত। কোথায় এখন যে রাখা যায়!

মা বলল, দাও তুলে রাখি।

—কোথায়?

—কেন ট্রাংকে।

—থাকবে ভাবছ?

—থাকবে না তো কে খাবে!

—তোমার মূর্তিমান শ্বাপদেরা সব করতে পারে। সব খেতে পারে।

পিলু বলল, আমি ধরব না তো বলেছি।

আমিও বললাম, কেউ ধরবে না বাবা, তুমি ভাঙা ট্রাংকটাতেই রাখ।

মা বলল, তোরা কিছু বলতে যাস না। তারপর কিছু হলে সব দোষ তোদের।

কিন্তু দু দিন ধরে পঞ্জিকাটা বাবাকে ভারি বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে রেখেছে। তিন দিনের দিন বাবা শেষ পর্যন্ত ট্রাংকে রাখাই স্থির করলেন। এত করেও পঞ্জিকার ভবিতব্য সম্পর্কে খুব একটা সংশয় থেকে গেল তাঁর। পিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার তো সংসারের সব কিছুই কাজে লাগে। এটাকে আর কাজে লাগাতে যেও না।

পিলু বলল, আমি ধরবই না।

যতই বলুক, আমিও বাবার মতো শেষ পর্যন্ত পিলুই অনিষ্টের কারণ হবে ভাবলাম। কারণ পিলুকে বিশ্বাস নেই। সে আজকাল সহজেই একশ রকমের মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে। এবং সেবারে বাবা প্রায় মাসখানেক বাদে নিরুদ্দেশ থেকে ফিরলে আনন্দে পিলু বনটার এমন সব জীবজন্তুর খবর দিয়েছিল তার সাহসিকতা প্রমাণের জন্য যে একটা কথাও সত্যি না। বাবার একটা আমলকি গাছের চারা পিলু তুলে নিয়ে তার পছন্দমতো জায়গায় ফের পুঁতে দিলে গাছটা মরে গেল। পিলু স্বীকারই করল না সে কাজটা করেছে। আমরাও ঠিক দেখি নি, বাবা বাড়ি নেই, খাওয়া দাওয়ার ঠিক নেই, পিলু বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়—এরই মধ্যে কখন সে কাজটা করেছিল আমরা কেউ জানিও না। অথচ পিলু ছাড়া এত বড় দুঃসাহসিক কাজ আর কেউ করতে পারবে না। তিন ক্রোশ দূর থেকে বাবা হেঁটে গিয়ে চারাটা এনে ছিলেন। ফিরতে ফিরতে সাঁজ লেগে গেছিল। বাবা সকালে গর্ত করে গাছটা লাগিয়েছিলেন। পিলু বলেছিল, তুমি রাস্তার পাশে লাগালে বাবা। সব আমলকি লোকে চুরি করে নিয়ে যাবে।—এই সুমার বনে লোক আসবে কোত্থেকে। পিলু বলেছিল, গাছটা বড় হতে হতে সুমার বনটা আর থাকবেই না। মানুষজন ঠিক চলে আসবে। ফল হলে চুরি যাবে ভয়ে সে ঠিক গাছটা ঘরের পেছনে বেশ একটা নিরিবিলি জায়গায় পুঁতে দিয়েছিল বোধ হয়। এবং শেষে মরে গেছে বলে বেশ কিছুদিন বাবা বাড়ি ফেরা পর্যন্ত ভাল মানুষ হয়ে ছিল। বাবার চেঁচামেচিতে বুঝতে পেরেছিলাম পিলুর খুব সদাশয় হয়ে যাওয়ার মূলে ছিল গাছটা।

তবে আমাদের সৌভাগ্য বাবা রাগ খুব বেশিক্ষণ পুষে রাখতে পারেন না। খেতে বসে বাবা পিলুর পাতে বড় পুঁটি মাছটা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, খা। একটা আমলকি গাছ কোথায় আবার

পাই। আমলকি ফল অজীর্ণ রোগে কত কাজে লাগে জানিস!

পিলু বেশ বড় মাছটার লেজ থেকে মাছ তুলে দুবার মাছটা চাটল। তারপর এক গাল হেসে বলল, জান বাবা কটা বাবু মতো লোক এসে না বনটা দেখে গেছে।

বাবা বললেন, কারা ওরা?

—আমি তখন না বাবা মাঠে ছিলাম। আমাকে বলল, খোকা তুমি থাকো কোথায়। বনের ভেতরে বাড়িটা দেখালে বলল, এই জঙ্গলে তোমরা থাক। ভয় লাগে না?

জঙ্গল বলায় পিলুর খুব রাগ হয়েছিল। সে বলেছিল, জঙ্গল কোথায়। এটা তো একটা বন।

—তোমার বাবা বাড়ি আছেন?

—বাবা কোথায় গেছেন।

—কোথায়, জান না?

—না। বাবা মাঝে মাঝে আমাদের ফেলে চলে যান।

এতে বোধ হয় বাবার আত্মসম্মানে লেগেছে। তিনি বললেন, কোথায় যাই আবার! দেশ গাঁয়ের লোক কে কোথায় এসে উঠছে খুঁজতে হয় না। এখানে আমাদের আর কে আছে। ওরা কোথাকার লোক জিজ্ঞেস করলি না?

—বলল কোটালিপাড়ার লোক।

—কোন কোটালিপাড়া? বুলতার কোটালিপাড়া না ফরিদপুরের কোটালিপাড়া। আর একটা কোটালিপাড়া আছে কিশোরগঞ্জের কাছে। এতকিছু বোঝ আর এটা বোঝ না। কোন কোটালিপাড়া জিজ্ঞেস করতে হয়। ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার মজুমদার মশাইরা তো রানাঘাটে বাড়ি করেছে।

বাবার ভূগোল এত জানা যে মাঝে মাঝে মনে হত অনায়াসে বাবা পৃথিবীর সব খবর দিয়ে যেতে পারেন। আসলে বাবা জমিদার স্টেটে আদায়ের কাজ করেছেন। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত

বাবাকে। কত সব মানুষ পৃথিবীতে বাবার চেনা হয়ে গেছে। তখন বাবার জন্য আমরা গর্ববোধ না করে পারতাম না।

বাবা আবার ফিরে আসায় সংসারে সবাই ফের নিশ্চিন্ত। কটা দিন আবার পেট ভরে খাওয়া। বাবা এ-কটা দিন কোথায় কি-ভাবে কাটিয়েছেন সারাক্ষণ সেই গল্প। কোথায় অনেকদিন পর কার বাড়িতে এই কর্তাঠাকুরটিকে পাবদা মাছের ঝোল খাইয়েছে তার বিশদ ব্যাখ্যা টিকা সহকারে মাকে বোঝাচ্ছিল।—পাবদা মাছ, তবে বুঝলে ধনবৌ, দেশের মতো না! তেমন পাবদা মাছ এ-দেশে পাওয়া যাবে কেন। এবং এই পাবদা মাছ প্রসঙ্গে বাবা এমন নিদারুণ সব ঝালঝোল শুকতোনির গল্প করছিলেন যে রাতে আর আমাদের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। আমরা সবাই মশারির ভেতর থেকে মুখ বার করে বাবার পাবদা মাছ খাওয়ার কথা শুনছিলাম।

পিলু বলে ফেলল, আমরা একদিন খাব বাবা।

—খাবে তো পাবেটা কোথায়। খেতে হলে রানাঘাটে যেতে হয়।

পিলু বলেছিল, রানাঘাট কতদূর বাবা?

—অনেক দূর। বড় হলে যাবে।

আমি বললাম, ও মা, তুই কি রে। আমরা যখন এদেশে এলাম তখন তো রানাঘাটের ওপর দিয়েই এলাম।

—সত্যি! পিলুর যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

মা বলল, ওর মনে না থাকারই কথা।

—রানাঘাটে আমরা রাতে ট্রেন বদল করলাম না বাবা! স্টেশনে ম্যাজেণ্টা রঙের আলো। কি রকম অদ্ভুত একটা দেশ মনে হচ্ছিল আমার। আর কত গাড়ি। এদিকে গাড়ি ওদিকে গাড়ি। মাথার ওপর দিয়ে একটা পুল চলে গেছে। ঘটাং ঘটাং শব্দ।

পিলুর বুঝি মনে হল ওটা একটা স্বপ্নের দেশ। সে বড় হয়ে একবার রানাঘাটে যাবে বলল।

বাবাও খুব আত্মবিশ্বাসের গলায় বললেন, এত দেশে গেছ আর রানাঘাটে যাবে না সে হয়।

এত দেশ বলতে বাবা তো আমাদের নিয়ে বেড়ালছানার মতো ছুটো বছর এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নবর বাবার খোঁজে তিনি সেই যে আমাদের প্ল্যাটফরমে ফেলে চলে গেলেন আর আসেনই না। সারাদিন না খেয়ে থাকার পর পিলু একটা বাড়ির পাশে শসার মাচান আবিষ্কার করে ফিরে এল। বিকেলে সে আমাকে নিয়ে সব দেখাল। আট দশটা কচি শসা। আমাদের চোখ মুখ এত ক্ষুধার্ত থাকত যে লোকে দেখলেই তেড়ে মারতে আসত। মা তো নির্বিকার। স্টেশনে দিনের পর দিন বাবার ফিরে আসার আশায় বসে আছে। পিলু সারাদিন না খেয়ে থাকলে ভীষণ বেয়াড়া হয়ে যায়। মাকে যা খুশি গাল দেয়। সেদিন সন্ধ্যায় দেখি দূরের মাঠে সোরগোল। পিলু কাছে কোথাও নেই। মাঠে দেখছি একদল ছেলে পিলুকে ঠ্যাঙাবে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আর পিলুর সেই আর্ত চিৎকার—দাদা রে। সেই প্রথম আমার মাথায় ভীষণ বুনো একটা মোষ তাড়া দিয়ে উঠেছিল। ছুটে গিয়েছিলাম। সবার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেছিলাম, আমার ভাইকে ছেড়ে দিন। ও শসা চুরি করেনি। আমরা খুব গরীব। বাবা তিন চারদিন হল কোথায় গেছে।

সেই ষণ্ডামতো ছেলেগুলো আমাকে দেখে কি ভাবল জানি না, পিলুকে ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছিল, হারামজাদা, তোমার ভাইকে সহ এবার তোমাকে প্যাঁদাব। আবার যদি দেখি এদিকে ঘুর ঘুর করছ কখনও।

সবিনয়ে বলেছিলাম, আর আসব না ইদিকে। পিলুর দিকে তাকিয়ে খুব গার্জেনি গলায় বললাম, তুই চুরি করেছিস। সত্যি করে বল ?

—নারে দাদা! মিছি মিছি ওরা আমাকে ধরে নিয়ে ঠ্যাঙাবে বলছে।

ওরা চলে গেলে পিলু ভারি সন্তর্পণে বলল, বাবাকে খুঁজতে যাবি আবার ?

—কোথায় ? .

—চল না। বলে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বড় একটা ইটের ভাঁটায়। কেবল জঙ্গল আর আগাছা। সামনে বড় বড় সব শিরিষ গাছ। পর পর সব উইয়ের বড় ঢিবি। ঢিবিগুলি পার হলে সুন্দর মতো দুটো মিনার। বোধহয় এখানে কোনো দরগা আছে। মেলা বসে কখনো। সে কি সব চিহ্ন দেখে ক্রমে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছিল। এখানে বাবা কেন মরতে আসবে বুঝতে পারছিলাম না। সে একসময় শিশুর মতো সরল গলায় বলল, এই যে পেয়েছি।· ঘাস পাতা সরিয়ে ফেলল সে দু হাতে। জ্বলজ্বল করছে কটা কচি শসা। সত্যি পিলু চুরি করেছে তবে। পিলু চুরি করেছে বাবা জানতে পারলে খুব কষ্ট পাবে। সে বলল, দাদা, তুই বাবাকে বলে দিস না। কিরে বলে দিবি না তো।

পিলুর এত ভারি কষ্টের মুখ আর আমি জীবনেও দেখিনি। বললাম, বলব না। পিলুর ওপর রাগটাও আর বেশিক্ষণ থাকল না। পেটের ক্ষিদেটা যে কি, যে কোনো কুকর্মই একসময় খুব মহৎ কাজ মনে হয়। কিছুক্ষণ আগে যে পিলুকে সেই ষণ্ডামতো ছেলেগুলো ঠ্যাঙাবে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, শসা কটা পিলু বাদে যে আর কেউ চুরি করেনি—ওরা ঠিকই ভেবেছিল, এবং আমার ভাই পিলু, তা ছাড়া পিলু আমার বাবার মতো মানুষের ছেলে, আমার সম্মানে খুব লেগেছিল—সে সব কিছুই আর মনে পড়ছিল না।

চারপাশে তাকিয়ে বললাম, কেউ আবার যদি দেখে ফেলে ?

—কত বড় জঙ্গল। কেউ এখানে আসেই না।

সত্যি বন জঙ্গলটা বেশ বড়। অদূরে রেল-লাইন, ইস্টিশান, লাল ইঁটের বাড়ি। পাড়াগাঁয়ের মানুষজনের চলাফেরার আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শসা কটা জামার তলায় লুকিয়ে ফেলা

দরকার। কে কোথায় আবার দেখে ফেলবে। এত সব গাছপালা পাখি, কাউকে যেন বিশ্বাস নেই। প্ল্যাটফরমে আমাদের থাকা খাওয়া এবং শসা কটা কি যে অমূল্য ধন তখন, আমি খাব, পিলু খাবে, মা খাবে, মায়া তো সব কটা একাই খেয়ে নিতে চাইবে। কিন্তু মা যদি না খায়। চুরি করা শসা মা না-ও খেতে পারে। তা ছাড়া মার মাথাও খুব একটা ঠিক নেই। বাবার আক্কেলের কথা ভেবে অদৃষ্টকে শাপমণ্যি করছে। আর ইস্টিশানে ট্রেন এলে আমরা দু ভাই হুটোপুটি লাগিয়ে দিই। এই বুঝি ট্রেন থেকে বাবা নামল। কত লোক আসে ট্রেনে অথচ বাবার মতো মানুষ ট্রেন থেকে একজনও নামে না। তখন পিলুর এই দুর্বুদ্ধিকে দুঃসময়ে বাহ্বা না দিয়ে পারা যায় না। পিলুর প্রতি বরং প্রগাঢ় ভালবাসাই আমার প্রবল হয়ে উঠল।

পিলু বলল, দাদা তুই একটা খা, আমি একটা খাই। সে একটা আমাকে দিল, নিজে নিল একটা। আর একটা শসা দেখিয়ে বলল, এটা মায়ার। এটা খাবে মা। দুটো থাকল, কাল সকালে খাব। পিলু খুব হিসেবী মানুষের মতো বলল, বাবা ফিরে না আসাতক আমাদের বেঁচে থাকতে হবে দাদা। প্ল্যাটফরমে ফিরে আসতে বেশ রাত হয়ে গেল।

বাবার হাতে পয়সা নেই। রেলগাড়িতে বাবার টিকিট লাগে না। পয়সা না থাকলে মানুষের যা হয়। খুব মিশুকে স্বভাবের মানুষ— যেখানেই তিনি যান, একসময় ঠিক ঠাকুরকর্তা বনে যান। ফলে পয়সা না থাকলেও কিছু আসে যায় না। ঠিক ট্রেনে চড়ে দূরদেশে চলে যেতে পারেন। বাবা কোথায় কি খায়, কি পরে, কে জানে! কোথায় ভাল মাছ দুধ পাওয়া যায়, চালের দাম কত কিংবা কোথাও যদি কিছু যজন যাজন করা যায় সেই আশায় বোধ হয় কেবল বাবা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেশ ছেড়ে এসে বাবা খুব অথৈ জলে পড়ে গেছেন—কিছু একটা করা দরকার, বাবার মুখের দিকে

আমরা আর তখন তাকাতে পারতাম না।

প্ল্যাটফরমের পানিপাঁড়ে বলল, কোথায় গেছিলে ছেলেরা ? বাবার খোঁজ মিলল।

পিলু বলল, বাবা কি আমার নিখোঁজ হয়েছে ?

—শুনেছি, তোমাদের ফেলে কোথায় চলে গেছে।

আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল পানিপাঁড়ের কথায়। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, আমার বাবা কি তেমন মানুষ ! আমাদের জন্য তাঁর কত দুর্ভাবনা। তবু কিছু বললে, কি আবার ভাববে, ওদের দয়াতেই এখানে পড়ে আছি। আবর্জনার মতো ঝেড়ে ফেললে যাবটা কোথায়।

পিলু এবং আমি খুবই সন্তর্পণে হাঁটছি। জামার নিচে বাকি কটা শসা। ধরা পড়ে গেলেই হয়েছে। সব চেয়ে ভয় আমার নিজের মাকেই। বলতে পারব না চুরি করে এনেছি। বরং বলা ভাল বড়বাবুর বউ দিয়েছে। কিন্তু মা তবে সকালেই জল আনতে গিয়ে বড়বাবুর বউকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারবে না। আমাদের এই দুঃসময়ে একটুকু কেউ দয়া দেখালেই মা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে। সুতরাং বুদ্ধি-বিবেচনায় যখন মাথায় কিছুই আসছিল না, পিলু বলল, মাকে সত্যি কথা বললে কিছু বলবে না দেখিস। এবং মাকে সব খুলে বলতেই কেমন তাড়াতাড়ি শসা কটা লুকিয়ে ফেলল। ধমক খেতে হতে পারে, এমনকি ঠ্যাঙাতেও পারে—আর কত সহজে মা আমার শসা কটা লুকিয়ে ভাল মানুষের ঝি হয়ে গেল।

আমি মায়ের যেহেতু খুব সুপুত্র, বললাম, পিলুর কি সাহস মা।

ছোট বোন মায়া পাশে পা গুটিয়ে ঘুমিয়ে আছে। পুনুটাও ঘুমে অচেতন। কেবল আমরা তিনজন প্ল্যাটফরমে জেগে। যেন যে কোনো সময় দেখব, প্ল্যাটফরম পার হয়ে বাবা চলে আসছেন।

মা শুধু বললে, ভগবান তো মানুষকে উপোষ রাখেন না।

পিলু দিগ্বিজয়ী বীরের মতো বলল, মায়া ওঠ। দেখ কি এনেছি।

মা বলল, না বাবা না। ডাকিস না। অনেক করে ঘুম পাড়িয়েছি, খাব খাব করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। থাকুক। সকালে তো হাতের কাছে কিছু নেই।

নীল লণ্ঠন ঝুলিয়ে একটা লোক হেঁটে চলে গেল। মা এই লোকটাকে দেখলেই মাথায় বড় ঘোমটা টেনে দেয়। ছেঁড়া মাদুর কাঁথায় একটা সংসার লেপটে আছে। বড় করুণ দেখায় প্ল্যাটফরমটা। যাত্রীরা তাকায়, দেখে। নতুন এই সব উদ্বাস্তুতে সব স্টেশনগুলি ভরে যাচ্ছে। কোনো সময় অযথা গালিগালাজও করতে থাকে কেউ। আমাদের সব গা-সওযা হয়ে গেছে। মনেই করতে পারছি না, আমাদের আবাস ছিল একটা। সেখানে শিউলি ফুলের গাছ ছিল। শরৎকালে আমরা ভাইবোনেরা মিলে ফুল তুলেছি। স্থলপদ্ম গাছ থেকে পদ্ম তুলে এনেছি। বাবা হাট থেকে তাজা আস্ত ইলিশ কিনে এনেছেন। বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা হয়েছে। আমের দিনে আম, লিচুর দিনে লিচু পেট ভরে খেয়েছি। বড় মাঠ ছিল, কখনও পার হয়ে গেছি তা। পুজোর ছুটি পড়লে স্কুল থেকে ফেরার পথে নৌকা ডুবিয়েছি জলে—কিছুই আর মনে করতে পারছি না। যেন কতদিন থেকে এমন একটা প্ল্যাটফরমে পড়ে আছি। আমাদের বাড়িঘর ছিল এখন দেখলে কে আর এটা বিশ্বাস করবে। আর সেই কবে থেকে একটা ট্রেন আসে যায়, সূর্য ওঠে আকাশে, শরতের জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভেসে যায়, বাবা তবু আসে না। বাবার মতো মানুষ আর নেমে আসে না ট্রেন থেকে।

ঘুম থেকে সকালে উঠেই অবাক। ট্রেন থেকে বাবা নামছেন। ইয়া বড় বড় পুঁটলি। ডেকেডুকে যেন গোটা প্ল্যাটফরমটাকেই কাঁপিয়ে তুলছেন।—নামা নামা। পিলু, ও বিলু, বাবা তাড়াতাড়ি আয়। ধর সব। দেখিস যেন কিছু থেকেটেকে না

যায়। শ্রাদ্ধের কাজটাজ কিছু সেরে বাবা ফিরেছেন। আমরা টেনে টেনে নামাচ্ছি। মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি। ছেঁড়া শীতল-পাটিতে বসে বাবা তখন তালপাতার হাওয়া খাচ্ছেন। —তা দেরি হল একটু। বামুন মানুষ, হাতের কাছে কাজ, ফেলে আসি কি করে।

আমার মা তখন শুধু চোখের জল ফেলছিল। কিছু বলছে না। সব গোছগাছ করে রাখছে। সকালের রোদ আমাদের খুব মনোরম লাগছিল। এমন সুন্দর দিন মানুষের জীবনে খুব কমই বুঝি আসে। পিলু তখন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছিল। পুনু বাবাকে দেখেই কোলে গিয়ে বসে পড়েছে। মায়া বাবাকে হাওয়া করছে। টের পেলাম, আমার বাবার হাতেও একটা নীলবাতি আছে। বুঝতে পারলাম, সিগনাল ডাউন। আমাদের গাড়ি ছাড়ার আবার সময় হয়ে গেছে। কোথায় গিয়ে গাড়িটা শেষ পর্যন্ত থামবে জানতাম না। আমাদের ছিল তখন এখানে সেখানে ছুটে বেড়ানোর জীবন। একটা নীলবাতি নিয়ে বাবা তাঁর বাড়িঘর খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

॥ চার ॥

পড়াশোনার ব্যাপারটা আমাদের এখনও কিছু তেমন ঠিকঠাক হয়নি। দেশ ছেড়ে আসার সময় আমার কিছু বই সম্বল ছিল। সে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক সব ক্লাসেই চলবে এমন ভেবে বাবা পাকাপাকিভাবে বাক্সে তুলে রেখেছিলেন। দুটো একটা বের করে নিতে বলেছেন। বাবার ধারণা ঠিকঠাক হয়ে বসতে না পারলে পড়াশোনায় মন বসবে না আমার।

বিউগিল বাজলেই বুঝতে পারতাম পাঁচটা বাজে। সকাল হয়ে গেছে। ব্যারাকে ফল-ইনের সময়। এবারে দূরে মানুষজন দেখতে

পাব বলে, বারান্দায় এসে দাঁড়াতাম আমরা, বাছারি ঘরটার টিনগুলি বাইরে টানা। ছায়া পড়লে বারান্দা হয়ে যায়। ঘরটার একমাত্র দরজা কেচার বেড়া। একটা তেলতেলে বাঁশের খুঁটি— দরজাটা তুলে রাখার জন্য ঠ্যাকার কাজ করে। এক পাশে ছোট্ট বেড়া দিয়ে মাকে ঘরের সংলগ্ন রান্নাঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোবরে লেপা উনুনের পাশে আছে বড় একটা মেটে হাঁড়ি কাঁঠালের বিচি ভরা। সকালের জলখাবার গোনাগুনতি কটা কাঁঠাল বিচি ভাজা। কারো ভাগে একটা কম হতে পারত না, বেশি হতে পারত না। বাবা কখনও ছেলেমানুষের মতো হাত পেতে বলতেন, বেশ খেতে। আর দুটো দাও না।

মা নির্বিকার। এমন উদাসীন মা, একটা আর কথা বলত না বাবার সঙ্গে। বাবা ভয়ে ভয়ে উঠে যেতেন।

তখন বাদশাহী সড়কের ওপর দিয়ে মার্চ করে যেত পুলিসেরা। কখনও ডবল মার্চ, কখনও কুইক মার্চ করে তারা যাচ্ছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে হত, বড় হলে আর স্টেশনমাস্টার হয়ে কাজ নেই। বরং পুলিস হব। বাবা বলেছেন, এতে খুব উন্নতি। খুব বড় সাহেব-সুবো হতে বাধে না। কাজ দেখাতে পারলে দারোগা পর্যন্ত হওয়া যায়। কোনো হাবিলদার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ডাকতেন, ঠাকুরমশাই আছেন। বাবার সঙ্গে কি সব কথাবার্তা হত। এবং কথাবার্তা শেষে বাবাকে মনে হত খুব অসহায়। এমন অবিষয়ী মানুষের জন্য বোধহয় লোকটারও করুণা হত। বলত, কি ঠাকুরমশাই, মরতে আর জায়গা পেলেন না। এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বাস করতে চলে এলেন।

বাবা কিছুতেই অবশ্য শেষ পর্যন্ত দমে যেতেন না। কারণ দমে গেলেই মা বাবাকে পেয়ে বসবে। কোথায় কি কথাবার্তা হয় মার কান খাড়া করে শোনার অভ্যাস। —লোকটা কি বললো গো। সুতরাং বাবা বিচলিত হতেন না শেষ পর্যন্ত। খুব আত্মবিশ্বাসের

গলায় বলতেন, মাটি, বুঝলে না, একবার সব আগাছা সাফ করতে পারলে দেখবে ফসল। জমি জুড়ে শুধু ধান। শীতের দিনে কলাই। সামনের জমিটাতে আম, জাম, লিচুর গাছ লাগিয়ে দেব। বড় হলে কত ফল। কত পাখপাখালি দেখবে তখন উড়ে আসবে। জমির ধানে সমবৎসর চলে গেলে দুটো একটা বাতাবি লেবুর গাছ লাগিয়ে দেব ভাবছি। এমন জমি মানুষ পতিত ফেলে রাখে।

আসল কথা অবশ্য কাউকে বলা যাবে না। বাবা খবর পেলেন মানু কাকা বহরমপুরে থাকে। বাবার সম্পর্কে পিসতুতো ভাই। খবর পেয়েই লটবহর নিয়ে রওনা। এবং কোনো দ্বিধা না করে পরম আত্মীয়ের মতো ভাই-এর বাড়িতে উঠে পড়লেন। আমাদের সেই কাকাটি বাবাকে দেখে একেবারে হতবাক। এতগুলো ছেলে মেয়ে নিয়ে কোনো খবর না দিয়ে কেউ কখনও আসে! দেশে অবশ্য খুবই যাওয়া-আসা ছিল। কাকার মা, এবং ভাইবোনেরা ঠাকুরদা ঠাকুমা বেঁচে থাকতে বর্ষায় দু-চার হপ্তা বেড়িয়ে যে না গেছে তাও না। সংসারে কোনো অভাব ছিল না বলে বাবা কিছুতেই তার পিসিকে এবং ভাই বোনেদের যেতে দিত না। সেই সুবাদে খবর পেয়েই সোজা সেখানে উঠে বললেন, চলে এলাম মানু। দেশে থেকে যা এনেছি শেষ। শোনলাম তুই এখানে আছিস। তুই যখন আছিস তখন আর ভাবনা কি। কিছু একটা ঠিক হয়ে যাবে। কি বলিস!

কাকা ঢোক গিলে বললেন, তা হয়ে যাবে।

কদিন যেতে না যেতেই কাকীমার গঞ্জনা শুরু হয়ে গেল। কাকা সারাটা দিন বাড়ি থাকে না। অফিসে থাকে। বাবা চুপচাপ বসে থাকেন মাদুরে। আগে তবু একটা চেষ্টা ছিল, এখানে এসে ওঠার পর বাবা কদিনেই কেমন ভালমানুষ হয়ে গেছিলেন।

কাকা একদিন বলল, সরকারী ক্যাম্পে উঠে যান দাদা। ক্যাম্পের খাওয়াদাওয়া মন্দ না। আমাদের অফিসের বড়বাবুর ভাই ক্যাম্পে চলে গেছে।

অভাব অনটনের কথা বোধহয় পাড়তে যাচ্ছিল, বাবা বললেন, ক্যাম্পে কোনো জাত বিচার নেই। আমি উঠি কি করে। তার চেয়ে এদিকে কোথাও পুজোআর্চা করে যদি থেকে যেতে পারতাম। তোর বৌদির তাই ইচ্ছা।

অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বাবার পৃথিবীটা কবেই ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেছে। মানুকাকারও বিড়ম্বনা। তাঁর ছেলেমেয়েরা আমার বয়সী, শহুরে মানুষ। পরিচয় দিতে কিছুটা কুণ্ঠাবোধ হওয়া স্বাভাবিক। এবং আমার মা কেমন সেই প্রথম মনে হল বাবাকে ডেকে গোপনে কিছু বলল। বাবা বললেন, তাই বুঝি। এবং পরদিনই বাবা মানুকাকার সঙ্গে কোথায় গেলেন। ফিরলেন রাত করে। বাবা ফিরেই বললেন, সব ঠিক হয়ে গেল, আর তোমাদের ভাবনা নেই।

সলতে জ্বালাবার শেষ তেলটুকু গোপনে এতদিন কি করে এত কষ্টের মধ্যেও সঞ্চয় করে রেখেছিল মা ভাবলে অবাক হতে হয়। অবশ্য জমি এবং যথার্থ বনভূমিতে হাজির হয়ে মার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছিল—তাই বলে শেষ পর্যন্ত এখানে !

বাবা বলেছিলেন, একেবারে জলের দরে জমি। একশ টাকায় কত জমি দেখ। তা তোমার পুরো একশও ছিল না। মানু কিছু দিয়েছে। জমির শেষ কোথায়, সীমানা কোথায় কিছুই বোঝার উপায় নেই। বাবা উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে চারটে গাছ দেখিয়ে বললেন, এই তোমাদের সীমানা। এ জায়গা তোমাদের।

বনের ভেতর সেই বড় চারটে গাছ সব কটাই শিরিষ। এবং লম্বা বরাবর আর যা আছে মাঝখানে, তার মালিক আমার বাবা। বাবা বনটার পাশে গ্রীকরাজের মতো দণ্ডায়মান ছিলেন। যেন বনটা রাজা পুরুর মতো বশ্যতা স্বীকার করতে চাইছে না। বাবা বললেন, এখানেই জঙ্গল সাফ করে তোমাদের আবাস তৈরি হবে। আগাছা

জঙ্গল সাফ করে বুঝতে হবে কতটা জমি শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। রাজবাড়ির আমলারা তো বেজায় খুশী। বলেছে বনটায় লোক-বসতি দেখলেই জমির দর বাড়বে। এবং যা বললেন, তাতে মনে হয়েছিল, টাকা না দিলেও প্রথম আবাস করার দুঃসাহসের জন্য মিনি-মাগনায় জমিটা পাওয়া যেত।

সুতরাং জলের দরে জমি—একটা অদূরে গাছ দেখে বোঝা যাচ্ছিল জমির সীমানাটা কোথায় শেষ। জঙ্গল সাফ করে শেষ পর্যন্ত কবে সেখানে পৌঁছনো যাবে সেটা বাবার ঈশ্বরই একমাত্র বলতে পারেন। বরং জমি না বলে বন বলা ভাল। বাঘের নিবাস ছিল, এবং যে দুটো-একটা এখনও নেই কে বলবে। বাবা যতই সাহসী হোন, অদূরে পুলিস ব্যারাক না থাকলে এখানে বাড়িঘর করার সাহস পেতেন না। সব বাবলা গাছ, নানা রকমের সব লতা, কাঁটা ঝোপ, কোথাও কোথাও সব মরা গাছের গুঁড়ি, ভাঙা ইটের ডাঁই। যত সাফ করে এগোনো যাচ্ছে, তত সব আবিষ্কার করা যাচ্ছে। হেস্টিংসের আমলের কুঠিবাড়িও বনের ভেতর মিলে যেতে পারে—কিংবা নগর-টগর ছিল—এখন শুধু তার ধ্বংসাবশেষ। বাবা সারাদিন কোদালে কুপিয়ে আগাছা তুলছেন, সঙ্গে আমি এবং পিলু। আর ঠুং করে কোদালে শব্দ হলেই বাবা খুব সচকিত হয়ে উঠতেন। বুঝি আছে কোথাও কোন গুপ্তধন। তিনি ঝুঁকে বসতেন, কোদাল মেরে সেই ইষ্টকখণ্ডের নাড়িসুদ্ধ টেনে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেন—ইষ্টকখণ্ড, না আসলে স্বর্ণপিণ্ড—বহুকাল মাটির নিচে পড়ে থাকায় বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সবাই দৌড়ে আসত। মা পর্যন্ত। মার মুখের কাছে নিয়ে বলতেন, কি মনে হয়। কেমন শক্ত দেখ। পাথর। পাথর আসবে কোত্থেকে! মা কিছু না বলা পর্যন্ত ফেলে দিতে পারতেন না।

মা বলত, আর কি মনে হয়! আমাদের কপাল খুলবে, ভালই হয়েছে।

বাবা অভয় দিয়ে বলতেন, পেয়ে যাব। ঠিক পেয়ে যাব। বুঝলে এটা কাশিমবাজার কুঠির কাছাকাছি জায়গা। একসময় খুব বড় নগর ছিল এখানে। কলকাতা শহর আর কত বড়, তার চেয়ে বড় শহর ছিল। মানুষজন, কুঠির সাহেবরা, পৃথিবীর সোনাদানা সব লুটেপুটে এখানে এনেই জড় করেছিল। বড় সদাগর, বেনে কি না ছিল। কত নীলকুঠির ধনরত্ন এখানে সেখানে মাটির নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঠিক পেয়ে যাব।

একদিন ছোট্ট দুটো শালগাছের চারা আবিষ্কার করা গেল। বাবা বললেন, থাক, বড় হলে কাজে লাগবে।

সারাদিনে বাপ বেটা মিলে পাঁচ-সাত হাত জমি সাফ করে ওঠা যেত না। আর মাঝে-মধ্যেই বাবার রহস্যময় অন্তর্ধান তো লেগেই আছে। তখন আমার পিলুর ছুটি। পিলু এখন এই বনভূমিটার ছোটখাটো একজন সামন্ত রাজা। আর আমি হচ্ছি তার দাদা।

কত রকমের সব যে লতাপাতা! আশ্চর্য লাল নীল ফুল বনের গভীরে ফুটে আছে। জঙ্গলের ভেতরে অদ্ভুত বড় বড় সব গিরগিটি, গোসাপ, বেজি। একটু সমতল মতো জায়গায়, যেখানে বেশ সবুজ ঘাস আছে এবং একটা ছোটখাটো উপত্যকার মতো মনে হয় ঢুকে গেলে, দেখা গেল দুরন্ত খরগোসেরা ছুটছে। আমাদের মটরশুঁটি গাছগুলোর ডগা রাখা যাচ্ছে না। কারা খায় বোঝাও যাচ্ছে না। সজারু এসে খেতে পারে—পিলু বলেছিল। বাবা বলেছিলেন, সজারু ডগা খায় না। মূল খায়। এবং এক সময় খরগোসের খবর প্রথম পিলুই এনে দিয়েছিল বাবাকে।

বাবা বললেন, খরগোসের মাংস খুব সুস্বাদু। কখনো খেয়েছ? আমরা কি খাই না খাই বাবার চেয়ে আর কে ভাল জানে! তবু তাঁর এমনধারা প্রশ্ন ছিল। যেন আমরা কত কিছু তাঁকে না দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি।

বাবা আরও বললেন, সজারুর মাংস খেতেও বেশ। তবে একটা দিন মাটির নিচে রাখতে হয়। তা না হলে গন্ধ যায় না।

বাবার রহস্যময় অন্তর্ধানের সময় আমরা একেবারে শুধু বনআলু খেয়ে দিন কাটাই সেটা বোধহয় তাঁর খুব মনঃপূত ছিল না। সঙ্গে মাংসের ঝালঝোল, বেশ জমবে তবে। আর বাবাও নিশ্চিন্তে দুটো দিন দেরি করে ফেললে, কিছু আসবে যাবে না। ঐ-সব ব্যাপারে বাবা পিলুকে যতটা গুরুত্ব দিত, আমাকে তার সিকি দিত না। এবং একবার বাবা না থাকায় পিলু ঠিক দুটো খরগোস শিকার করে চলে এল। মা বলল, করেছিস কি। এমন সুন্দর দুটো খরগোসকে মেরে ফেললি!

পিলু খুব মুষড়ে পড়ল। বলল, বাবা যে বলেছেন খরগোসের মাংস খেতে বেশ।

—তোমার বাবা এবার আরও কি তোমাদের খেতে বলবেন কে জানে।

পিলু খুব একটা অপরাধ করে ফেলেছে—কি করা যায়। মা কিছুতেই রাঁধতে রাজী হচ্ছে না। অগত্যা এ-সব ক্ষেত্রে সে আমারই শরণাপন্ন হতে পছন্দ করে। মায়া তো উল্টে-পাল্টে দেখে ওক তুলে ফেলল। এবং আমিই বললাম, ঠিক আছে, তোমরা কেউ খাবে না। আমি, পিলু খাব। এবং যখন কেটেকুটে থালায় রাখা হল, হলুদ বেটে মাখা হল, সামান্য আদা বাটা, রসুন, পেঁয়াজ দিয়ে বেশ সুঘ্রাণ তৈরি হয়ে গেল, তখন মা বলল, দাও রেঁধে দিচ্ছি। তোমরা তো দেশ ছেড়ে এসে এক-একজন বকরাক্ষস হয়ে গেছ। এখন যা পাবে তাই খাবে।

কিছু চাল ছিল ঘরে, মা দুটো ভাতও ফুটিয়ে দিল। এবং খেতে বসে দেখা গেল, কেউ বাদ গেল না। মা নিজেও বড় পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে ফেলল শেষটুকু। বলল, খেতে তো বেশ। তোর বাবা এলে আবার দুটো ধরে আনবি তো।

বাবা বাড়ি থাকলে ঝোপজঙ্গল কেটে রাখা আমাদের কাজ। এবং টেনে আনা, অথবা কোন ঝোপজঙ্গল টেনে আনতে না পারলে রেখে দেওয়া। শুকোলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। কতসব গাছের গুঁড়ি আর ইঁটের চাতাল। কোনো ঢিবি আবিষ্কার করলেই বাবা গুপ্তধনের গন্ধ পেতেন। সহজে হাত দিতেন না। মনে হত বুঝি ঢিবিটা আছে থাক। সময় মতো খুঁড়ে ধনরত্ন তোলা যাবে।

জঙ্গল কাটতে কাটতেই বাবা কখনও চেঁচিয়ে বলতেন, ওদিকে না। এদিকে চলে এস। তেনারা পড়ে আছেন।

তেনারা কে এবং কি রকমের আমাদের এতদিনে বেশ ভাল জানা হয়ে গেছে। বলতাম, কোথায় বাবা ?

ঐ দেখ। আলিসান ভুজঙ্গ। এতটুকু ভয় ভীতি নেই। পিলুটার ছিল আবার খুব বাড়াবাড়ি। সে লাঠি তুলে তেড়ে গেলে বাবা বলতেন, তোমার তো কোনো অনিষ্ট করেনি। কেন মারতে যাচ্ছ।

এত বড় আলিসান ভুজঙ্গ দেখে আমাদের হৃৎকম্প দেখা দিত। বাবা কিন্তু নির্বিকার। কাজ করে যাচ্ছেন।

॥ পাঁচ ॥

আমাদের খাওয়া-দাওয়াটা এখন কোনো নিয়মমাফিক ব্যাপার নয়। ভাত খাওয়াটা আমাদের কাছে ভোজের মতো। ভাত না থাকলে, বনআলু না পাওয়া গেলে শুধু গাছের পেঁপে সিদ্ধ করে খাওয়া। কিছু পেঁপে শহরে নিয়ে যেতে পারলে বিক্রি হত। দু-একদিন পেঁপে বিক্রির পয়সায়ও ভাত মাছ হয়ে যায় কখনো। এবং বাবা একদিন গোটাদশেক বড় সাইজের পেঁপে পেড়ে

একটা ঝোলায় নিয়ে চাল সংগ্রহের জন্য চলে গেল। কিন্তু আর ফিরল না।

ঠিক শহরে বাবা মানুকাকার কাছে কোনো খবর পেয়ে চলে গেছে কোথাও। ফিরবে যখন, মাথায় বড় সব পোঁটলাপুঁটলি। আমার কেবল ধারণা হত, বাবা গোপালদীর বাবুরা কোথায় আছে জানতে পারলে গুপ্তধন পেয়ে যাবে। বাবুদের সঙ্গে দেখা হলে পূজা পার্বণে বাবাকে ডাকবে। দেশে থাকতে ওরা খুব দিত থুত। দু আড়াই বছরে বাবার স্বভাবধর্ম আমাদের খুব জানা। না থাকলেও এখন আর মা এবং আমরা তেমন দুশ্চিন্তা করি না। পিলুটা কেবল বনের ভেতর অন্ধকার ঢুকে গেলে রাতে ভয় পায়। ঘর থেকে বের হতে চায় না। ওর ধারণা, বাবা যেহেতু বাড়ি নেই, ভূত প্রেত দৈত্য দানোরা সুযোগ বুঝে নিশীথে একটা লম্বা হাত বনের ভেতর থেকে বাড়িয়ে দেবে। এবং আমাদের ছোট বাড়িঘর তুলে নিয়ে মাথায় টোপর পরে বসে থাকবে। এই ভয়টাই খুব কাবু করত পিলুকে।

আর মার মনে হত, বাবা বাড়ি না থাকলে যা হোক একটা লোকের আহার বেঁচে গেল। কারণ তিনি যেখানেই যান বেশ চালিয়ে নেন। কোথাও বাবার কিছু অভাব থাকে না। এবং যদি কোনো শিষ্যবাড়ির খোঁজ পাওয়া যায়—বাবা সেখানে তো ধর্মগুরুর মতো। এমন কি তখন সেখানে মচ্ছব-টচ্ছব লেগে যায়। তারপর ফেরার সময় নগদ টাকা, মার জন্য প্রণামীর শাড়ি, আমাদের জন্য শীতের চাদর নিয়ে আসতে পারেন।

বাবা পরদিনও ফিরল না। আশ্চর্য, এবারে মাকে খুব চিন্তিত দেখাল। মানুষের বাড়িঘর হয়ে গেলে এমনটাই বুঝি হয়। সকালের দিকে মা বলল, একবার যা তোর মানুকাকার কাছে। মানুষটা কোথায় গেল খবর নিবি না?

পিলু বলল, চল দাদা, বাবাকে খুঁজে আসি। এবং দুজনে কাকার

বাড়ি গেলে জানলাম, বাবা গেছে বেথুয়াডহরি। পেঁপে বিক্রির পয়সা কাকার কাছে রেখে গেছে। কাকা আমাদের খেয়ে যেতেও বললেন। পিলু বলল, দাদা আমার তো খাবার ইচ্ছে খুবই। তোর? আমার কি ইচ্ছে কী করে পিলুকে বোঝাই, তবে অস্বস্তি এই যে, কাকার ছেলেমেয়েদের পোশাক এবং পারিপাট্য এত বেশি যে গেলে চাকর-বাকরের মতো মনে হয় নিজেদের। তবু খেতে বলায়, দুজনই খুব খুশি। খাবার লোভে একটা ঘরে দুজনে চোরের মতো বসে থাকলাম। একটা কথা বললাম না ভয়ে। খুড়তুতো ভাইবোনেরা দু-একবার উঁকি মেরে গেল। আমরা তখন অন্য দিকে চেয়ে থেকেছি। যেন আমরা খাওয়া বাদে পৃথিবীতে আর কিছু জানি না বুঝি না। বড়ই সুবোধ বালক। ওদের চোখে চোখ পড়ে গেলেই টের পাই বড়ই অদ্ভুত দুটো জীব আমরা। কাকা অদ্ভুত দুটো জীব ধরে ঘরে পুরে রেখেছে। ওদের কৌতূহল মেটাবার জন্য যতটা পারলাম খাঁচায় পোরা দুটো হরিণ শাবকের মতো মুখ করে রেখেছি। যদিও খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল, তবু খাবার লোভে পালাতে পারছি না। খেতে বসে কোনোরকমে ঘাড় গুঁজে আমরা খেয়ে ফেললাম। পিলু ভাত খেতে খুব ভালবাসে বলে আকণ্ঠ খাওয়া ঠিক বোঝে না। ও বোধহয় ঘিলুতক ঠেসে খেল। খাওয়া দেখে হাঁ হয়ে গেল আমাদের ভাইবোনেরা। পেটে কি ধামা বাঁধা আছে— এত খায় কি করে। অন্য ঘরে ওরা ফিস ফিস করে কথা বলে খুব হাসাহাসি করছিল। সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। আর লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছিল।

কাকা গুনে দু টাকা দশ আনা পয়সা হাতে দিয়ে বললেন, ধনদার ফিরতে দেরি হবে বলে গেছে। বেথুয়াডহরিতে দেশের লোক এসেছে অনেক। খবর পেয়েই চলে গেল। তাছাড়া তোদের কিছু শিষ্যবাড়িরও খোঁজ নিতে যাবে বলেছে।

বাবার একটা খেরোখাতায় আজকাল রাজ্যের সব মানুষজনের নাম

ঠিকানা লেখা থাকে। পিতামহের আমলের কিছু শিষ্যদের নাম বাবা 'পুনরায়' হেডিং দিয়ে লিখে রেখেছেন। বাবা দেশে থাকতে হেলায় এই গুরুগিরির ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন এই দুঃসময়ে তাদের খোঁজখবর করে বেড়াচ্ছেন বোধহয়। তাছাড়া নিবারণ দাসের দেওয়া পঞ্জিকাটা তো বগলে রয়েছেই। এত বড় একটা মূলধন যাঁর আছে তাঁর আবার ভাবনা কি।

ট্রেনে বাবার যেহেতু পয়সা লাগে না, বাবা সহজেই যে কোনো সময় খুশিমত সুদূরে চলে যেতে পারেন। যারাই দেশ ছেড়ে এসেছে, সবাই প্রায় রেল-লাইনের লাগোয়া গ্রামে গঞ্জে অথবা কোনো পতিত জমিতে নিজেদের আবাস গড়ে তুলছে ক্রমশ। রেলে বাবার টিকিট লাগে না এটা বড়ই গৌরবের ব্যাপার আমাদের কাছে। আর বাবার অকাট্য যুক্তি, আমরা ছিন্নমূল মানুষ, সব দেশের স্বার্থে, এটা কত বড় আত্মত্যাগ! আমাদের আবার ভাড়া কি। অথবা কখনও বাবা যেন দেশ ভাগ করে নেহরু যে ভুল করেছেন বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে তার খানিকটা উশুল করে নিচ্ছেন। বাবা তাঁর বিনা টিকিটে ট্রেনের ভ্রমণ-কাহিনী ফিরে এসে সগৌরবে বলতে খুবই ভালবাসতেন।

আর থাকা খাওয়ার ব্যাপারটা বাবার যে কোনো জায়গায়, যে কোনো পরিচিত মানুষের বাঁড়িতে আজন্ম অধিকারের সামিল হয়ে গেছে। যদি খোঁজখবর মিলে যায়, আর খোঁজখবর না মিললেও কোনো লতাপাতায় সম্পর্ক খুঁজে পেলে একেবারে তখন মৌরসীপাট্টা— থাকা খাওয়া, দেশের গল্প, এমন সোনার দেশ মানুষকে ছাড়তে হয় কত বড় পাপ করলে, সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা। বাবার কথাবার্তা শুনলে সবার বোধহয় মানুষটার ওপর মায়া পড়ে যায় এবং সহজে ছাড়তে চায় না। এবং বাবা যখন গেছে, আর মানুকাকাকে বলে গেছে তখন খুবই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

আমরাও ডাল ভাত মাছ খেয়ে বেজায় খুশি। যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব কাকার বাড়ি থেকে বের হওয়া দরকার। পেট ভরে খাওয়ার আনন্দটা ঠিক উপভোগ করা যাচ্ছে না। কারণ কাকার ছেলে-মেয়েদের বিরূপ কথাবার্তা খুবই খোঁচা দিচ্ছে পেটে। কাকা এবং কাকীমাকে যত দ্রুত সম্ভব টুপটাপ প্রণাম সেরে বের হয়ে পড়া গেল। এবং শহরের রাস্তায় কতসব অলৌকিক ঘটনা দেখা গেল ক্রমে। রিক্সা চড়ে মানুষেরা যায়। জানলায় সুন্দর মতো মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্জুনগাছটার নিচে একটা চায়ের দোকান। সবাই চা খাচ্ছে। বিকেল পড়ে আসতেই শহরের ঠাণ্ডা ভাব। সিনেমাহাউসে রামের সুমতি বই হচ্ছে। বাদ্য বাজছিল। বইয়ের কত দোকান, জেলখানার পাঁচিল পার হয়ে গেলে জলের ট্যাঙ্ক। টাউন ক্লাব। পাশে পুলিসের ব্যারাক। উর্দিপরা ব্যাণ্ড-পার্টি আগে আগে ব্যাণ্ড বাজিয়ে যাচ্ছে। পুলিসের সব খাকি পোশাক, আর রূপোর বকলেশ নীল আকাশের নিচে এক চিত্রকরের ছবির মতো। তারপরই বালিকা বিদ্যালয়। একই রকমের নীল ফ্রক পরে দলে দলে মেয়েরা বের হয়ে আসছে। একটা সুন্দর দোতলা বাড়ির টবে গোলাপের গাছ। পাশে ইজিচেয়ারে বালিকা নিবিষ্ট মনে কোনো গল্পের বই পড়ছে। এতসব ঘটনা একটা শহরে রোজ ঘটে। এক জীবনে এতটা দেখা যায় যেন আমার আগে জানা ছিল না।

তারপরই সোজা সড়ক চলে গেছে রেল-লাইন পার হয়ে। দু পাশে বড় বড় সব শিরিষ গাছ। পাতা ঝরছে। শন শন হাওয়া কবরখানা থেকে উঠে আসছে। সাহেবদের কবরখানা ডান দিকে। এবং কত সব সমাধি ফলক আর কত প্রাচীন সব ঝাউগাছ। যত শহর শেষ হয়ে আসছে তত নিঝুম পৃথিবী। গাছপালা পাখি তত বেশি। কতশত বছরের পুরনো সেই বাড়িটা যেন, ভাঙা শ্যাওলা ধরা রাজপ্রাসাদের মতো। একটা টগর ফুলের গাছ, চত্বরে আর কিছু নেই। মজা দিঘী, ভাঙা ঘাটলা। আর এ-সব পার হয়ে ডান দিকে গেলেই সেই কারবালা। বনটার

আরম্ভ। কোথাও ভিতরে কবে কোন্ আদ্যিকালের ইটের ভাটা। এবং এখানেই নবমী বলে সেই বুড়িটা থাকে। পিলু বাড়ি ফেরার পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য কারবালার মাঠে নিয়ে এল আমাকে। এবং বনের এক আশ্চর্য মোহ আছে পিলুর। সে ইতিপূর্বে এই বনের ভেতর দুটো আমড়া গাছ, কিছু পেয়ারা লিচু গাছ এবং একটা কাঁঠাল গাছও আবিষ্কার করে ফেলেছে। আর নবমীকে এই ফাঁকে দেখিয়ে নিয়ে যাবে—কারণ আমার মতে নবমী একটা ডাইনি না হয়ে যায় না। আমার ভুল ভাঙাবার জন্যই যেন পিলু এই পথটা ধরে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সামান্য ক্লান্ত বোধ করছিলাম। পিলু তখন বলল, আমি খুব বেশি খেয়েছি নারে দাদা?

সত্যি কথা বললে যদি পিলু মনে কষ্ট পায়, ভেবে বললাম, কোথায় বেশি খেলি। ওটুকু না খেলে পেট ভরবে কি করে!

পিলু বলল, আয় দাদা, এখানে একটু আমরা গড়িয়ে নি। বড় উঁচু মতো একটা কড়ুই গাছ। নিচে সবুজ ঘাসের মাঠ। বেশ অনায়াসে শোওয়া যায়। বনটার ভেতরে ঢোকার আগে নিরিবিলি জায়গাটাতে বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা গেল। দূরে রেল-লাইন। একটা গাড়ি যায় সন্ধ্যায়। পাশে কাশের বন দিগন্তব্যাপী। কেবল কারবালার মাঠটা একটু দূরে। দুটো একটা মিনার, ভাঙা মসজিদ এবং একটা কুকুর বাদে কিছুই আর চোখে পড়ছিল না।

পিলু বেশ নিশ্চিন্ত মনে গাছের নিচে শুয়ে আছে। আমিও পাশে। বললাম, তুই এখানে কখনও এসেছিলি?

সে বলল, কত। কতবার এসেছি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গরুর গাড়ি যাবার রাস্তা আছে। ও রাস্তাটা ধরেই যাব।

আমার কেমন গা ছমছম করছিল। ভয় লাগছিল। পিলুটা কিন্তু দিনের বেলায় একদম ভয় পায় না। ওর শুধু ভূতের ভয়।

এছাড়া ওর অন্য কোনো ভয় নেই। দিনের বেলায় ভূত-টুত বের হয় না।

বেশ লাগছিল। শহর ঘুরে দেখা গেল। বাবার খোঁজ পাওয়া গেল। আকণ্ঠ খাওয়া গেল। একজন মানুষের জীবনে আর কি দরকার তখন বুঝতে পারছিলাম না। এবং প্রকৃতির ভেতর আমরা দুই ভাই, এক অন্য জগত, শুধু পাতা ঝরছে আর নানা বর্ণের সব পাখিরা উড়ে যাচ্ছিল। গাছে বসে ডাকছিল।

গাছের নিচে শুয়ে দুই ভাই কত কথা বললাম। পিলু আবার বলল, সে বড় হয়ে রানাঘাটে যাবে। বলল, দাদা, তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হবি। আমি একটা দোকান দেব। দুজনে রোজগার করলে বাবার কোনো দুঃখ থাকবে না। পিলু বাবারও খুব প্রশংসা করল। বলল, বাবা ভাগ্যিস জায়গাটা খুঁজে বের করেছিল। পিলুর মতে এমন সুন্দর জায়গা আর কোথায় আছে। আসলে তখন আমি বুঝতে পারি এই বনজঙ্গলের আশ্চর্য একটা টান আছে। ছোট্ট ঘর—মা বাবা, রাতে কখনও বাবার ফিরে আসা, কখনও বনজঙ্গলে পিলুর ভ্রমণবিলাস, সব মিলে জায়গাটার আলাদা মাহাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। পিলু না থাকলে এ-বনজঙ্গলের সব সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যায়। যেন এতদিন এই বনটা ঘুমিয়েছিল, পিলু আসায় বনটা জেগে গেছে। শীত-গ্রীষ্মে বনের পাতা ঝরা থেকে আরম্ভ করে সব প্রাণীকুল এক ছোট্ট বালকের কাছে কতকাল পর যেন ধরা পরে মহিয়সী রূপ ধারণ করেছে।

পিলু কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলল, ঐ যে ঘরটা দেখছিস ওটার মধ্যে নবমী থাকে।

—ঘর কোথায়! এ তো পুরনো ইঁটের পাঁজা।

কাছে গেলেই নবমী পিলুকে দেখে বলল, ওমা, পিলু দাদা যে!

আমি তো অবাক। ভারি ভাব বুড়িটার সঙ্গে! শনের মতো সাদা চুল। একটাও দাঁত নেই। একেবারে কঙ্কালসার শরীর। ঘরের বার

হতেও কষ্ট। কচুর মূল, বনআলু এবং কাঠের মধ্যে ঘুসঘুসে আগুন এই সম্বল করে বেঁচে আছে। নবমী আমাকে দেখে বলল, এ কেডা পিলু দাদা ?

—আমার দাদা। তোমাকে দেখাতে এনেছি।

নবমীর শরীরে শুধু শুকনো কলাপাতার পোশাক। কোমর থেকে হাঁটু অবধি। বোধহয় মানুষের সাড়া শব্দ পেয়েই সে তার মহামূল্য পোশাক পরিধান করে অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসেছে। নতুবা বনের মধ্যে তার উলঙ্গ হয়ে ঘোরা-ফেরার অভ্যাস। এবং বয়স খুব কাবু করে ফেলেছে দেখে বললাম, নবমী, তোমার ভয় করে না ?

—না দাদা।

—তুমি এখানে কেন আছ ?

—এমন জায়গা কোথায় আর আছে দাদা !

—অসুখ-বিসুখে তোমাকে কে দেখে ?

সে ওপরে হাত তুলে দেখাল। কি আশায় এখানে পড়ে আছে ভাবতে খুবই বিস্ময় লাগছিল আমার। কতদিন থেকে আছে কে জানে! এবং যা ভয় ছিল, তা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল ওর কথাবার্তা শুনে। একটা ছাগলের তিনটে বাচ্চা হয়েছে। সে পিলুকে বলল, দাদা তুমি বামুনের ছেলে, বলেছিলে একটা ছাগলের বাচ্চা নেবে। আর নিতে এলে না তো।

পিলু বলল, বাবা বেথুয়াডহরি গেছে। এলে বাবার কাছে পয়সা চেয়ে রাখব।

—পয়সা দিয়ে কি হবে গো দাদা। ওমা আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন যে গো দাঠাকুরের দল। আমার কত পাপ, বলে সে দুটো ইঁট পেতে দিল। বলল, বসেন।

আমার তখন কত রকমের কূট প্রশ্ন মাথায়। বললাম, নবমী, তোমার আর কেউ নেই ?

—কেউ নেই কেন হবে গো। এত বড় একটা সংসার আমার।

তার পরে পিলু দাদা শেষ বয়সে এইসে গেল—কি আর লাগে।

—ওরা খোঁজখবর নেয় না তোমার?

নবমীর মুখটা সরল হাসিতে ভরে গেল। বড় জানতে ইচ্ছে হয়, ওর সেই শৈশবের কথা। কত বয়স এখন—মনে হয় সত্তর আশি। তার ওপরও হতে পারে। বললাম, তোমার বয়স কত নবমী? সে বলল তিন কুড়ি বছর হবে এখানটায় আছি। সেনবাবুদের ইঁটের ভাটিতে আমার মরদ সর্দার ছিল গো বাবু। দশাসই মানুষ। সে পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, পিলু দাদা, আপনার বাবাঠাকুর আসবেন বলেছিলেন। এল না তো। একবার গড় হতাম। গড় হলে মুক্তি মিলে যেত।

নবমীর এত বড় সংসারে কে কে আছে জানতে চাইলে বলল, ছিল তো অনেক দাঠাকুর। বয়স বাড়ছে, তেনারাও ছুটি নিচ্ছেন।

ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, তেনারা কারা?

—ঘর বার হতেই কষ্ট। খোঁজ খবর করতে পারি না। দু পা হাঁটলেই হাঁটু ব্যথা করে দাঠাকুর। আমি না গেলে ওরাই বা আসবে কেনে বলুন।

কেমন রহস্যময় কথাবার্তা। বললাম, ওরা কারা?

নবমী ঘর থেকে দুটো নারকেল বের করে দিল। বলল, বাবাঠাকুরকে দিবেন।

ফের বললাম, তাহলে তোমার কেউ নেই।

—আছে গো আছে। ওপরে হাত তুলে দেখাল—তিনি আছেন। চারপাশের গাছপালা দেখাল হাত তুলে, তেনারা আছেন। দূরে কোনো বন্য প্রাণীর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল—বলল, তেনারা আছেন। তারপর গাছের ফল-মূল, ঋতু পরিবর্তন, ফুলের সৌরভ—সবই অমৃতময় এখানকার। চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বলল, এত সব আমার দাঠাকুর। মানুষটা নেই বলে, ইঁটের ভাটা উঠি গেল বলে, একা ভাববেন না। মানুষটাকে ওই যে দেখছেন শিমূল গাছ, তার

নিচে রেখে দিইছি। তেনার কথাবার্তাও কানে আসে। বলতে বলতে নবমী হাঁপিয়ে উঠল। একটা কংকালসার প্রাণে কত আকাঙ্ক্ষা। ওর চামড়া কুঁচকে স্থবিরতা এসে গেছে শরীরে। তবু এই বনভূমির মাঝে নবমীকে মনে হচ্ছিল বড়ই সুন্দরী। বয়েসকালে সে আমার মার মতো তার মানুষের অপেক্ষায় কত রাত না জানি জেগে থেকেছে। বনটাকে ভালবেসে ফেলছে। সে আর কোথাও চলে যেতে পারেনি। শেষে নবমী বলল, মানুষের বাড়ি-ঘরের বড় মায়া। কোথায় আর যাব দাঠাকুর।

॥ ছয় ॥

মাকে ফিরে এসে বললাম, বাবা বেথুয়াডহরি গেছে।

—কার কাছে?

—বলে যায়নি কিছু।

—কবে ফিরবে, কিছু বলেনি?

—না।

মার মুখটা কেমন দুশ্চিন্তায় ভরে গেল। এই আবাসভূমি তৈরির পর, না অন্য কোনো কারণে, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, এবারে বাবা চলে যাওয়ায় মাকে খুবই অসহায় দেখাচ্ছিল। বাবা বাড়ি না থাকায় এবং কবে ফিরবে বুঝতে না পারায় একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তির ভিতর যেন পড়ে গেছে। মনে হল, সবাই কাছে আছে, কেবল একটা মানুষ ঘুরছে, কি খায় কোথায় থাকে এ-সব ভেবেই হয়ত মার মুখটা এত করুণ দেখাচ্ছে। সুখে হোক দুঃখে হোক মানুষটা এই নতুন আবাসে একটা বড় গাছের মতো। এটাই বোধহয় মার ভরসা। আগের মতো আর উদাসীন থাকতে পারছে না। মাটিতে শেকড় ঢুকে যেতে থাকলে বুঝি তাই হয়।

বাবা বাড়ি না থাকলে পিলু সংসারের অভিভাবক গোছের। সে একদিন সকালে উঠে বলল, এই দাদা ওঠ। যাবি না ?
মনে পড়ে গেল রাতে পিলু বলে রেখেছে, খুব সকালে উঠতে হবে। ঝাঁকায় যাবে পেঁপে, কিছু মূলাশাক। আপাতত এই বিক্রি করে যা-কিছু উপার্জন। সকালেই উঠে পড়া গেল। সূর্য ওঠেনি। আকাশে বাতাসে বনভূমি থেকে শেষ সবুজ গন্ধ ছড়াচ্ছে। রোদ উঠলেই গন্ধটা কেমন মরে যায়। গাছপালা পাখ-পাখালি তখন জেগে যায় বলে গন্ধটা বুঝি আর থাকে না।
জমিতে সুন্দর সতেজ সব মূলাশাক। শীতের শেষাশেষি বলে এবং অসময়ের প্রায় বলা যায় এই সব্জি দামে বিক্রি হবার খুবই সম্ভাবনা। পিলু রাতে বলেছিল, মা, আমরা কতদিন আবার পেট ভরে ভাত খাইনি। পিলুর যা কাজকর্ম, দেখে মনে হচ্ছে সে আজ পেট ভরে ভাত খাবে। এটা যে সংসারে কত দরকারী কাজ পিলুর মুখ না দেখলে বোঝা যাবে না। সকাল থেকেই সে একজন বিষয়ী মানুষের মতো গম্ভীর।
শহরে রওনা হবার সময় মা বলল, দাঁড়া। একটা লালপেড়ে শাড়ি ট্রাঙ্ক থেকে বের করে বলল, নিয়ে যা। কোথাও বিক্রি করে টাকা নিস।
পিলু বলল, তুমি এটা কেন দিচ্ছ মা। বাবা জানতে পারলে কত কষ্ট পাবে।
মা বলল, জানবে না।
মাকেও সকালে খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছিল। তবু কেন যে গভীরে তাকালে বোঝা যায় আশ্চর্য এক বিষণ্নতা আছে মায়ের চোখে। বাবা বাড়ি না থাকাতেই বোধ হয় এটা হয়েছে। আমরা সবাই পেট ভরে খাব, বাবা বাড়ি নেই, বাবা খাবে না, বাবার ছেলেমেয়েরা পেট ভরে খাচ্ছে, তিনি জানতেও পারবেন না। বোধহয় দুঃখটা এ-জন্যই মায়ের এত বেশি।

এবং যেভাবে তাড়া লাগিয়েছে পিলু, যেন বেশ আমরা আগেকার মতো মানুষ। বাজারহাট, মেলা, টাকচাঁদা মাছের ঝোল, ঘোড়-দৌড় কত কিছুতে ভরে ছিল আমাদের জীবনটা। সকাল থেকেই হাঁক ডাক—নিপুণভাবে সবকিছু সাজিয়ে নিয়েছে ধামায়। আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল—শহর দু-ক্রোশের ওপর। শহর যেখানে আরম্ভ হয়েছে, সেখানে এখনও রাতে হ্যাজাক জ্বলে। আলো আসেনি। এবং চায়ের দোকান, মোটর গ্যারেজ, কিছু পাইকার মানুষ বসে থাকে—তাদের কাছে কম দামে সব বিক্রি করে দিতে হবে। ঝাঁকায় নিয়ে যাওয়া মুটে মানুষের মতো ভাবতে খুব খারাপ লাগছিল।

পিলু বলল, কিরে দাদা, আয়। তুলে দে।

পিলু নিজের ঝাঁকাটায় প্রায় বেশিটা নিয়েছে। আর পিলু বুঝি বুঝতে পেরেছিল, মাথায় এভাবে মুটে মানুষের মতো বয়ে নিয়ে যাওয়া তার দাদাটা পছন্দ করে না। সে তাড়াতাড়ি বলল, মা, একটা ব্যাগ দাও না ? পেঁপে কটা দাদা ব্যাগে নিক।

যদিও খুব স্বার্থপরের মতো দেখাচ্ছিল তবু পিলুর ওপর সামান্য সদাশয় হওয়া গেল। পিলুকে আগে আগে যেতে বললাম। পেছনে, বেশ দূরে, দূরে আমি। পিলুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক আছে রাস্তার মানুষেরা, অথবা কোনো লোকালয়ে ঢুকে গেলে বুঝতেই পারবে না কেউ। সবচেয়ে বেশি সেই দোতালা বাড়ি, টবে গোলাপফুলের গাছ, বালিকার ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়া জায়গাটায় দূরত্ব আমাদের আরও বেড়ে গেল। পিলু আমার মান-সম্ভ্রম সম্পর্কে বেশ সচেতন। সে সারা রাস্তায় এমন কি সেই সুন্দর মতো সোনালী ফ্রক গায়ে মেয়েটার কাছে বুঝতেও দিল না আমি তার দাদা হই। পিলুর ওপর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল।

আর পিলু প্রায় রীতিমতো দাম দর করে : কী যে বলছেন, এ দামে দেওয়া যায়। কি পেঁপে দেখেছেন, এক একটা কত বড় দেখেছেন !

ভেতরটা কত পুষ্ট, আর যা মিষ্টি হবে সে না বলাই ভাল। একবার খেলে সারাজীবন মনে রাখতে হবে। প্রায় একজন দোকানীর মতো দরদস্তুর করে সবটা বিক্রি করে দিল। তারপর নতুন লাল পেড়ে শাড়িটা বিক্রি করা। সেও ছোট্ট একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকে বেশ দামেই বিক্রি করা গেল। এবং গুণে দেখা গেল সবসুদ্ধ বার টাকার কাছাকাছি। এতগুলো টাকা একসঙ্গে আমরা অনেকদিন দেখিনি। প্রায় যেন আমরা যাদুকরের মতো বলশালী মানুষ। আমাদের হাতের মুঠোয় পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচুর্য। এত টাকায় কি হবে প্রথমে স্থিরই করা গেল না। কি কিনব, কি না কিনব—বাজারসুদ্ধু সব তুলে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আমাদের। মাছের বাজারে ঢুকে খুব বড়লোকি চালে কথাবার্তা বলতে থাকল পিলু।—মাছ তো তোমার ভাল না। এ-মাছ মানুষে খায়! পচে গেছে। দেখি ওটা। আরে দাদা দেখ, চাপিলা মাছ—কিনব। চাপিলা মাছ এ-দেশে এসে আমাদের কখনও খাওয়া হয়নি। পিলুর লোভ বেড়ে গেল। বেশ দামেই সে কিনে ফেলল পোয়াটাক মাছ। পুরো আট আনা পয়সা তিন-বার গুনে পিলু লোকটার হাতে দেবার আগে ফের আমাকে গুনতে দিল। তারপরও পিলুর সংশয় গেল না। হিসাবে সে খুব পাকা।

তারপর শহর ছাড়িয়ে আটাকল ফেলে এবং সেই ভূতুড়ে সাঁকোটার কাছে আসতেই পিলু কেমন দুঃখী গলায় বলল, পেট ভরে ভাত খাব। বাবা দেখতে পাবে না। খুব খারাপ লাগছে।

সাঁকোটার নিচে নেমে বললাম, দুদিন পরে হলে কি হত। বাবাও থাকত। সবাই মিলে খেতাম। পিলু কিছু বলল না। সে ঝাঁকা মাথায় হাঁটছে। ডাল, আলু, মশলাপাতি, আনাজের মধ্যে বড় বড় বেগুন, যেমন দেশবাড়িতে আমাদের হাসিমের মাথায় বাবা হাট ফেরত সওদা করে ফিরতেন, মাছের থলে হাতে আমারও প্রায় সে-ভাবে ফিরছি। গাছে গাছে রোদ, মানুষজন রাস্তায়, গরুর

গাড়ি পাট বোঝাই, ছোট গঞ্জ মতো জায়গা পার হয়ে সোজা মিলের পথ ধরে হাঁটছি। আমাদের বাড়ি ফেরার আর একটা রাস্তা আছে পিলুর সঙ্গে ফেরার সময় টের পেলাম।

পিলু একটা রাস্তা দেখিয়ে বলল, এদিকে গেলে বিষ্ণুপুরের কালী-বাড়ি। মাকে নিয়ে একবার আসব। ওদিকে গেলে রাজবাড়ি। তোকে নিয়ে একদিন যাব। সারা রাস্তায় পিলু সব চিনিয়ে নিয়ে গেল। যাবার সময় শহরটার দক্ষিণের রাস্তায় গেছি, ফেরার সময় উত্তরের রাস্তায়। আর সবই দেখছি পিলুর নখদর্পণে। বড় হলে পিলুর গাড়ি ঘোড়া না হয়ে যাবে না। কত কম বয়সে সে কত বেশি অভিজ্ঞ।

আমার হাতে চালের ব্যাগ। এবং যেহেতু বাবা বাড়ি নেই, এ-দিয়ে আমাদের কতদিন যে চালিয়ে নিতে হবে। চাল সামান্য, কিছু বনআলুর কুচি, একেবারে মা নিপুণভাবে কেটে নেয়। আলুর কুচি-সেদ্ধ সরু চালের ভাতের মতো মনে হয়—এ-ভাবে ভাত আর আলু কুচি ভাতের মতো আমাদের পাতে—কোনোরকমে জীবনধারণ করা, পেট ভরা নিয়ে কথা—যে কোনো ভাবে, যে কোনো উপায়ে। আজ ভাতে আলুর কুচি থাকবে না, সত্যিকারের ভাত মাছ খাব ভাবতেই মনটা পুলকে ভরে গেল।

পিলু বোধহয় সেই আনন্দেই জোরে হাঁটছে। কতক্ষণে মাকে তার এই সওদা নিয়ে দেখাবে! মা হেসে ফেললেই পিলু দুটো লাফ দেবে—আরে ব্বাস, মাগো মা, একদিন তোমায় আমি কালীবাড়ি নিয়ে যাব। ওখানে মানত করলে সব হয়। আমাদের সব হবে না মা! আমরা বেশিদিন আর গরীব থাকব না।

শীতের রোদ উঠতেও সময় লাগে না। চলে যেতেও সময় লাগে না। দুপুর হয়ে গেল ফিরতে। মা, মায়া রাস্তায় ছুটে এসেছে। যেন মা আমরা কতক্ষণে ফিরব, সেই আশায় পথ চেয়ে বসে ছিল। মাছ দেখে বলল, খুব তাজা মাছ। আনাজপাতি মা কত যত্নের

সঙ্গে ঘরে তুলে নিলেন! রাতে আজ পেট ভরে আহার, সত্যিকারের ভাত মাছ। মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় সুখ, বড় আরাম আর কি আছে।

রাতে বাড়িতে ভোজ। চাপিলা মাছের ঝোল সঙ্গে ধনেপাতা। ভাবা যায় না। যেন বাড়িটাতে রাতে উৎসব হবে কিছু। মা পুকুর থেকে চানটান করে এল। পিলু কাঠ সংগ্রহ করছে। রাতে মার রান্না করতে যেন এতটুকু কষ্ট না হয়। মায়া খুব বিনয়ী হয়ে গেছে। যত কাজ কাম, যেমন ঘর ঝাঁট দেওয়া, উঠোন ঝাট দেওয়া, সব এক হাতে করে ফেলছে। বাসন-কোসন ধুয়ে রাখছে। মশলা বেটে দেবে মাকে বায়না ধরলে মা বলল, পারবে না। ওটা আমি করে নেব। কেউ রাগ করছে না আজ। বচসা করছে না। পুনুকে মায়া আজ আর কোল থেকে নামাচ্ছেই না। গাছ, পাতা, পাখি, কীট-পতঙ্গ যেখানে যা আছে পুনুকে সব দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। রাতে ভাত মাছ, বেগুন ভাজা, ভাজা মুগের ডাল। মাকে পিলু গাছ থেকে একটা ছোট কচি লাউ পর্যন্ত কেটে দিল। সব দেখে বোঝা যায় দিন দিন যথার্থই বনভূমিটা মানুষের ঘরবাড়ি হয়ে উঠছে। সুতরাং বাড়িটাতে সবাই আমরা উৎসাহী মানুষের মতো যেখানে যা কিছু কাজ সেরে ফেলছি। পিলু একটা কোদাল নিয়ে বের হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগে আগে সে ফিরে এল। বনের মধ্যে সারা বিকেল সে কি করেছে আমি জানি। সে বড় একটা বনআলুর লতা ঠিক আবিষ্কার করে ফেলেছে। একটা অতিকায় বনআলু কাল পরশুর মধ্যে বাড়িতে চলে আসবে বোঝা গেল।

পিলু ফিরে এলে মা বলল, কিরে পেলি?

পিলু বারান্দায় কোদাল রেখে ঠিক বাবার মতো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। চোখ মুখ উত্তেজনায় খুব অধীর। সে শুধু বলল, কত বড় মা। সে দু হাত ছড়িয়ে দেখাল।

মার বিশ্বাস হল না। পিলু বলল, দু হাত মাটি তুলেও ওর শেষ

নাগাল পেলাম না মা। অর্থাৎ প্রায় মণখানেক ওজন না হয়ে যাবে না। চারপাশে মাটির অভ্যন্তরে আলুর শাখা-প্রশাখা ঢুকে গেছে। সে সবটাই তুলে আনবে বলে, খুব বড় মতো গর্ত করে রেখে এসেছে। কাল বাকি যা আছে করে ফেললেই সেই প্রকাণ্ড হাতির দাঁতের মতো, কিংবা তার চেয়েও বড় একটা বনআলু। বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত বনআলুটা গোলায় মজুত শস্যের মতো কিছুদিন পিলুকে অহংকারী করে রাখবে।

সূর্য অস্ত যাবার মুখে, মা আমাদের সবাইকে হাত পা ধুয়ে আসতে বলল কালীর পুকুর থেকে। লণ্ঠন জ্বেলে পড়তে বসতে বলল। দল বেঁধে আমি পিলু মায়া ঘড়া নিয়ে গেলাম সেই মাঠ এবং জঙ্গল পার হয়ে কালীর পুকুরে। হাত মুখ ধোওয়া, সঙ্গে রান্নার জল। পিলু ব্যারাকের টিউকল থেকে খাবার জল নিয়ে এল। ফিরে আসার সময় দেখতে পেলাম, দূরে বনের গভীরে বাড়িটাতে পিদিম জ্বলছে। তুলসী গাছের নিচে মা রোজ এই পিদিম দিচ্ছে কদিন থেকে। প্রণিপাত করছে ধরণীকে। জীবন ধারণের সব উপায় মানুষের যেমন থাকা দরকার, তেমনি শুভাশুভর জন্য ঈশ্বর বড় প্রয়োজনীয় জীব। মা তাঁর সব প্রার্থনা এই সময় সেরে নেয়। বনের গভীরে অন্ধকার। বারান্দায় লম্ফ জ্বালিয়ে রেখেছে। এখন আর শুধু বাড়িটা নয়, তার চারপাশে যা কিছু আছে, এমনকি আকাশ নক্ষত্র এবং বনভূমি সবটা মিলে আমাদের আবাস। আকাশ থেকে কেউ যদি ছোট্ট একটা নক্ষত্রও তুলে নেয়, টের পাব যেন আমাদের কেউ কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে।

রান্নাঘরে মা রান্না করছে এক হাতে। পুনু আমাদের পাশে বসে ঢুলছিল ঘুমে। পিলু খুব পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে ফেলল। শ্লেট এগিয়ে দিয়ে সে পর পর তিনটে মিশ্র যোগ অঙ্ক করে, হাতের লেখা লিখতে বসে গেল। আমি ডেফোডিলস কবিতাটা

মুখস্থ করতে থাকলাম, টেন থাউজেণ্ড আই স এট্ এ গ্ল্যান্স··· তারপর পড়লাম—হোম দি ব্রট ওয়ারিয়র ডেড। এবং এই কবিতা পড়তে পড়তে কখন জন কিটসের ট্ অটাম পড়ছি খেয়ালই নেই—জোরে জোরে, যেন এই আবাস এবং বনভূমি পার হয়ে আমার কণ্ঠস্বর দূরে কোনো এক অলৌকিক ভুবনে ছড়িয়ে পড়ছে। অ্যাণ্ড গেদারিং সোয়ালোজ টুইটার ইন দি স্কাইজ। আমার মা তখন ভাজা মুগের ডালে সম্বার দিচ্ছে। আশ্চর্য সুঘ্রাণ চারপাশে—আমরা কত সহজে কত বেশি মনোযোগী পড়ুয়া হয়ে গেলাম।

মায়া পড়ছিল, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। পড়তে পড়তে ঘুমে ঢুলছিল মায়া। পিলু বলল, এই মায়া, ঘুমোচ্ছিস কেন রে ?

মায়া বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে দাদা।

পিলু খুব গম্ভীর গলায় বলল, চোখে জল দিয়ে আয়। ঘুমিয়ে পড়লে খেতে পাবে না। আমরা সব খেয়ে নেব।

সঙ্গে সঙ্গে মায়া দৌড়ে উঠে গেল। ফিরে এসে পড়ল ফের—আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে ··। সে কিছুতেই আর ঘুমোবে না ঠিক করেছে।

ক্রমে অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এল। মাথার ওপরে আকাশ, কিছু নক্ষত্র। বনভূমিতে পাতা পড়ার শব্দ পাচ্ছিলাম। কত সব কীট-পতঙ্গের আওয়াজ এবং দূরে শেয়ালের হাঁক। বাবা বাড়ি না থাকলে, বড় ভয় লাগে। যেন বনটা ধীর পায়ে খুব কাছে এগিয়ে আসে। সহজেই আমাদের বাড়িটাকে গ্রাস করে নেয়। চারপাশে গাছপালা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তখন চোখে পড়ে না।

ভোজ হবে বলে, পিলু কলাপাতা কেটে রেখেছিল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম, কখন মা বলবে, তোমরা খেতে এস। পিলু

পড়া ফেলে মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দেখছে—আর কত দেরি। এত বেশি সময় ধরে তার পক্ষে মনোযোগী পড়ুয়া হয়ে থাকা কঠিন। মা কেবল বলছিল আর একটু পড় বাবা। এই তো হয়ে গেল বলে। সে ফের এসে কিম্ভূতকিমাকার গলায় তীব্র আওয়াজে চেঁচিয়ে ফের পড়া শুরু করে দিল। আমি বললাম, এই পিলু, এত জোরে পড়ছিস কেন রে। সে কর্ণপাতই করছে না। মাকে বললাম, দেখো মা, পিলু ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। পড়তে দিচ্ছে না।

মা বুঝি বুঝতে পেরেছিল, পিলু আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। রাগে দুঃখে সে এখন পড়ার নামে চেঁচাচ্ছে। হেসে বলল, আসন পেতে তোরা বোস। দিচ্ছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে পিলু বইটা মাথার ওপরে ছুঁড়ে ফের কপ করে ধরে বলল, ওঠ ওঠ। বলে প্রায় টান মেরে মাদুর-ফাদুর তুলে আসন পেতে ফেলল। গ্লাসে গ্লাসে জল। কলাপাতা ধুয়ে নুন রাখল পাশে। মা আমাদের ভাত বেড়ে দিচ্ছে। পিলুকে যত দিচ্ছে তত খেয়ে নিচ্ছে। আমার পাতেও ভাত পড়ে থাকছে না। এবং পিলুর খেতে খেতে সহসা মনে পড়ে গেল, সে সবই খেয়ে ফেলছে না তো ! সে বলল, মা, তোমার জন্য কিন্তু রেখ।

—আছে। তোরা খা।

—কৈ দেখি !

মা হাঁড়িটা তুলে এনে দেখাল।

—দি আর দুটো।

—তোমার তবে থাকবে কি।

—হয়ে যাবে। নে না।

আমি বললাম, পিলু তোর পেট ভরেনি।

সে তাকিয়ে থাকল। গলা অবধি খেয়ে এখন বোধহয় কানে-টানেও কম শুনছে।

— তুই উঠে দাঁড়া তো দেখি !

পিলু উঠে দাঁড়াল।

—জামাটা তোল। পেটটা দেখি।

সে চাদর সামলে কোনোরকমে জামাটা তুলে পেটটা ভাসিয়ে দিল।

—পিলু করেছিস কি! তোর পেট ফাটল বলে।

পিলু আমার কথা শুনে খুব ঘাবড়ে গেল। তবু সে দোনোমোনো গলায় বলল, যা!

—নুয়ে দেখ, পেটটা কি হয়েছে তোর!

সে নুতে গিয়ে কেমন হাঁসফাঁস করতে থাকল। বলল, দাদারে, নুতে পারছি না।

মাকে বললাম, আর তুমি দিও না। দেখেছ পেটের রগগুলো পর্যন্ত ভেসে উঠেছে!

মা এবার লম্ফ তুলে পিলুর পেটের কাছে উঁকি দিয়ে সত্যি দেখল। বলল, কই। তুই যে কি না! ও আরো দুটো খেতে পারবে। বলে মা পিলুর পেটে দুটো টোকা মারল।

—ঠিক আছে থাক। পেট ফেটে গেলে আমি কিছু জানি না।

পিলু সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেল। সে বলল, না মা, আর লাগবে না। সে ফস্ করে প্যান্টের গিঁট খুলে কিছুটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারপর হাত চাটতে বসে গেল।

মায়ার খাওয়া হয়ে গেছে। আমারও। মায়া শেষ পর্যন্ত মাছটা আস্তই রেখে দিয়েছে পাতে। সবার খাওয়া হলে, সে তারিয়ে তারিয়ে মাছটা খাবে। এটা মায়ার চিরদিনের অভ্যাস। ভাল সুস্বাদু খাবার দিলেই সে হাতে রেখে দেবে। মাঝে মাঝে খাবে, চাটবে। আমাদের শেষ না হলে সে শেষ করবে না।

তখনই মনে হল রাস্তায় অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অথবা এগিয়ে আসছে মতো। বাবা বাড়ি না থাকলে, সাঁঝ লাগলেই আমাদের গা ছম-ছম করতে থাকে। যত রাত হয় তত ভয়টা বাড়ে। গভীর রাতে কখনও ঘুম ভেঙে গেলে গুটিসুটি শুয়ে থাকি পিলুকে জড়িয়ে। রাতে একা আমরা ঘর থেকে কেউ বের হতে সাহস পাই

না। মা পাশে না থাকলে ভীষণ ভয় করে—তখন এমন একটা ছায়া-ছায়া মানুষের অবয়ব অন্ধকারে এগিয়ে আসতেই কেমন আমরা সবাই গুটিয়ে গেলাম। ছায়াটা উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় চিৎকার করে উঠতাম সবাই—তখনই লম্ফের আলোতে দেখলাম—সেই হাবিলদার লোকটা। লম্বা জুলফি, গোঁফ ঝুলে পড়েছে। দশাসই একটা দৈত্যের মতো। উঠোনে দাঁড়িয়ে বলছে, ঠাকুরমশাই আছে? মা আমার কেমন ঠাণ্ডা গলায় বলল, পিলু বলে দে, তিনি বাড়ি নেই।

—কোথা গেছেন?

অন্ধকারেও লোকটার চোখ জ্বলছিল। লম্বা মোটা গোঁফ, নাক-থ্যাবড়া অতিকায় এক পাষণ্ডের মতো চেহারা। হাবিলদার লোকটা ব্যারাকে থাকে। এত রাতে বাবার সঙ্গে এমন কি কাজ বোঝা গেল না।

—কখন আসবে?

মা আবার ভেতর থেকে বলল, পিলু বলে দে, কবে ফিরবেন কিছু বলে যাননি।

পিলু হঠাৎ মুখিয়ে উঠোনে নেমে বলল, কেন, কি দরকার?

পিলুর সাহসে আমিও সাহসী হয়ে উঠলাম। এতক্ষণ বারান্দা থেকে কিছুতেই উঠোনে নামতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। পিলুর পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে বললাম, বাবা ফিরলে কিছু বলতে হবে?

—না। কিছু বলতে হবে না। শেষে বলল, তোমার পিতাঠাকুর কেমন লোক আছে!

পিলু বলল, ভাল লোক আছে।

লোকটার এত কি দায় বোঝা গেল না। পিতাঠাকুর ভাল কি মন্দ আছে আমরা বুঝব। আর লোকটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। পিতা-ঠাকুর বাড়ি নেই, আর কি কাজ কার সঙ্গে লোকটার থাকতে পারে। মা ভেতর থেকে কিছুতেই বের হচ্ছে না। এত ভয় মার আমি

কখনও দেখিনি। এমন এক বন-জঙ্গলে কেউ খোঁজ-খবর নিতে এলে ভাল লাগারই কথা।

পিলু বলল, বাবা কাজে বেথুয়াডহরি গেছে।

মা খুব সন্তর্পণে বলল, বলে দে, তোর বাবা এলে যেন আসেন।

লোকটা তখন খুব আপনজনের মতো বলল, ইতো ঠিক নেহি আছে। ইসান বন-জঙ্গলে রাখকে চলা গিয়া!

বাবার নামে কেউ খারাপ কিছু বললে, পিলুর মাথা গরম হয়ে যায়। সে কেমন চোয়াড়ে গলায় বলল, কাজ থাকলে যাবে না। বাবা এলে কিছু বলতে হবে?

—কুছ বুলতে হবে না। একবার কি ভি মোনে হল, যাই ঠাকুর-মশাইর সাথ দেখা করি।

লোকটা যেন কি খুঁজছে। কথা বলছে, আর ধূর্ত চোখে ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। চারপাশের এই নির্জনতা, গভীর অন্ধকার আর জোনাকি জ্বলছিল বলে লোকটার মতলব খুব ভাল ঠেকছে না। মা ঘরেই বসে আছে। মায়া এঁটো বাসনকোসন খুব দ্রুত ঘরে তুলে রাখছে। এই লোকটা আরও দুবার আমাদের বাড়ি এসেছিল। বাবা বাড়ি না থাকলেই চলে আসে। কি করে যে টের পায়, বাবা বাড়ি নেই। অন্য দুবার দিনের বেলায় এসেছিল বলে, আমাদের তত ভয় ছিল না। মাও সহজভাবে দুটো একটা কথা বলেছে। কিন্তু আজ মাও কেমন দুর্ব্যবহার করছে লোকটার সঙ্গে। বলছে, পিলু বলে দে, তোর বাবা এলে খবর দিবি।

—বাবা এলে জানাব। তখন আসবেন।

তবু লোকটার যাবার নাম নেই। কিছু করলে শত চিৎকারে কেউ কিছু টের পাবে না। অনায়াসে আমাদের সুন্দর ঘরবাড়ি লোকটা লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। এই প্রথম একজন মানুষ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে কি ভীষণ এবং ভয়াবহ টের পেলাম। লোকটা অথচ এমন কিছু করছে না, বরং লোকটার যেন দরদের শেষ নেই—তবু

মার ভয়ার্ত মুখ দেখে আমরা ভারি কাবু হয়ে যাচ্ছি। এমনিতে মা ভীষণ সাহসী। কোনো ভূত-প্রেত, সাপখোপে মা এতটুকু ভয় পায় না। এ-সময়ে আমরা কি করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

মা তখন কেমন শক্ত গলায় ঘর থেকে বলল, আপনি যান। উনি বাড়ি নেই। এলে বলব, আপনি এসেছিলেন।

লোকটা তারপর আর দাঁড়াল না। চলে গেল। কেমন রাহুগ্রাস থেকে সমস্ত পরিবারটা যেন রক্ষা পেয়েছে। বাইরে থাকা আর নিরাপদ নয় ভেবে মা আমাদের সবাইকে ঘরে ঢুকে যেতে বলল। পিলু গেল না। সে উঠোনে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় লোকটাকে দেখল। বনজঙ্গলে কীট-পতঙ্গের আওয়াজ, কিছু শেয়ালের হাঁক এবং ক্রমে দূরাগত কোনো নিথর শব্দ বনভূমির অভ্যন্তরে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে যেন। রাতে আর মা বের হতে সাহস পেল না। কেবল বাবাকে গালমন্দ করতে থাকল। রাতে মা আর খেলও না। পিলু সকাল হলে কিছু একটা প্রতিবিধানের জন্য কোথায় যে না বলে না কয়ে বের হয়ে গেল।

॥ সাত ॥

সকালে উঠেই দেখি মার মুখ ভার। বাবার ওপর অভিমানে মা কারো সঙ্গে একটা কথা বলছে না। পিলু কোথায় গেল, দুপুর হয়ে গেল, এখনও ফিরে আসছে না—অন্য সময়ে মা স্থির থাকতে পারতো না। অথচ আজ সব জ্বলে পুড়ে যাক, কি হবে ঘরবাড়ি দিয়ে—যেমন বাবা, তার ছেলে আর ভাল হবে কোত্থেকে, একটা চিঠি দিয়েও তো জানাতে পারে, তা না। যেন আমরা সব ভেসে এসেছি। এ-সব থেকেই বোঝা গেল মার মন-মেজাজ খুব খারাপ। আর মন-মেজাজ খারাপ হলেই আমাদের কপালে দুর্ভোগ বাড়ে। খুব ভয়ে

ভয়ে আছি। কার পিঠে কখন কি পড়বে কিছুই বলা যাচ্ছে না। মার কাছেপিঠে থাকা আজ আর খুব নিরাপদ নয়।

তখনই রাস্তায় একটা লোক সাইকেল থেকে নেমে ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজাচ্ছে। ডাকছে আমাকে—এই ছেলে, এটা অমুকের বাড়ি? আমি দৌড়ে চলে গেলাম। পোস্টাফিসের লোক। গায়ের জামা প্যান্ট সাইকেলের থলে দেখেই বুঝে ফেলেছি। লোকটাকে বললাম, হ্যাঁ।

—সুপ্রভা দেবী বলে কেউ আছেন? মনিঅর্ডার আছে।

মাকে দৌড়ে গিয়ে বললাম, মা তোমার নামে মনিঅর্ডার এসেছে। মা তো খুব হতবাক হয়ে গেল। বলল, সত্যি!

লোকটা তখন সাইকেলটা গাছে হেলান দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। মায়া তাড়াতাড়ি আসন পেতে দিল একটা। লোকটা বসেই বলল, এক গ্লাস জল দিন আগে খাই। এখানে বাড়িঘর হয়েছে কি করে জানব বলুন। তিন-চার দিন ব্যারাকে ঘুরে গেছি, ও-নামে কোথায় এখানে কে আছে কেউ বলতে পারে না। ভাগ্যিস একটা চিঠি এসেছে আজ। এবং চিঠিটার ওপর ঠিকানা লেখা, পরম কল্যাণীয়া সুপ্রভা দেবী, গ্রাম নিমতলা। তারপর লিখেছেন, পুলিস ব্যারাকের অদূরে দক্ষিণমুখী বাড়ি। পোঃ কাশিমবাজার। চিঠিটা না এলে আপনাদের মনিঅর্ডার ফিরে যেত।

মা একটা কথাও বলছে না। সামনে একটা প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় সুখ কপালে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। মনি-অর্ডারে টাকা আসবে, মা স্বপ্নেও ভাবেনি। চিঠি আসবে সেটাও যেন বিশ্বাস করা যায় না। মাসাধিক হয়ে গেছে, বাড়ি ছেড়ে গেছে বাবা—টাকাই বা পাবে কোথায়! পিয়ন দেখিয়ে দিল, এখানে টিপ দিন। মা হয়ত টিপই দিত, কিন্তু আমি মনে করিয়ে দিলাম, এখানে তুমি মা সই কর। মার হস্তাক্ষর ভারি সুন্দর। এবং মা যখন সই করল, পিয়নটাও হতবাক হয়ে গেল। কেমন নিজের মানুষের মত বলল, দেশ ভাগে কত মানুষের যে কপাল পুড়েছে।

আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। বললাম, চিঠিটা দিন।

—দিচ্ছি দিচ্ছি। আগে টাকা কটা গুনে নাও। তুমি এখানটায় আর একটা সই করে দাও। দেখ চল্লিশ টাকা আছে। সবই এক টাকার নোট। গুনে বললাম, ঠিক আছে। তারপর সেই লোকটা দেবদূতের মতো একটা নীল খাম বের করে দিল। কল্যাণীয়া সুপ্রভা দেবী। মার চিঠি। তাকিয়ে দেখলাম, মার চোখ জলে ভরে গেছে। মা টাকা কটার দিকে ফিরেও তাকাল না। চিঠিটা নিয়ে কোথায় মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

পিলু ফিরে এল, বেশ বেলা করে। কদিন থেকে শীত পড়েছে খুব। সকালে অন্য সব দিনে খড়কুটো সংগ্রহ করে পিলু আগুন দেয়। আমরা তখন আগুনের পাশে গোল হয়ে বসি। রোদ না উঠলে, শীত না কমলে কেউ নড়ি না। মা কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে হাত সেঁকে নেয়। ঠাণ্ডা জলে মার হাত তখন সাদা দেখায়। মনে হয় কেমন রক্তশূন্য হাত। সকালবেলায় এত কি কাজ, একটু বেলা হলে সহজেই কাজ করা যায়—কিন্তু রোদ না উঠতে সব বাসি থালাবাসন ধুয়ে রাখা, গোবরছড়া, ঘরের দাওয়া লেপে দেওয়া মার বড় জরুরী কাজ। মানুষের ঘরবাড়ি হলে যে যে স্বভাব—মারও তাই। পিলু সকালেই বের হয়ে গেছিল বলে আগুন জ্বালানো হয়নি। অন্য দিনের মতো আগুনের উত্তাপে আর আজ আমাদের ঘুম ভাঙেনি। যখন ভাঙল, তখন দেখলাম বেশ বেলা হয়ে গেছে। গাছের মাথায় শীতের রোদ চিকচিক করছে। তারপর কত সুখবর সংসারে—ডাকপিয়ন এসেছিল—বাবার চিঠি এসেছে, টাকা এসেছে। পিলু কিছুই জানে না। সেই পিলু শীতের চাদর গায়ে যখন ফিরল তখন মনে হল বগলের নিচে কিছু একটা কুঁই কুঁই করছে। কি কোথা থেকে ধরে এনেছে কে জানে।

বললাম, জানিস পিলু, ডাকপিয়ন এসেছিল। মার নামে মনিঅর্ডার,

নীল খামে চিঠি।

সে কানেই তুলল না কথাটা। খুব সতর্ক চোখে রাস্তার দিকে কি দেখছে। আমি বললাম, তোর চাদরের নিচে কুঁই কুঁই করছে কে রে? সে খুব ভারিক্কি চালে ঘরে ঢুকে গেল। পিছু পিছু আমরা গেলে দেখলাম, একটা কুকুরছানা সে বগলের নিচ থেকে বের করছে। আশ্চর্য কি নরম তুলোর বলের মতো একটা কুকুরছানা পিলু কোত্থেকে নিয়ে এসেছে।

ভয়ে বাচ্চাটা লেজ গুটিয়ে আছে। এক ফাঁকে পালাতেও চাইছিল কিন্তু পিলু খপ করে ফের ধরে ফেললে—ত্রাহী চিৎকার শুরু করে দিল তুলোর বলটা। মা এসে দেখে তাজ্জব। বলল, হ্যাঁরে তুই এটা আবার কোত্থেকে নিয়ে এলি। দুধের বাচ্চা বাঁচবে কেন? সারাটা সকাল টো টো করে ঘুরে বেড়ালি। একটু পড়াশোনা করলি না। তোরা আর আমার হাড়মাস কত পুড়িয়ে খাবি।

কারো কোনো কটূ কথায় পিলুর যেন এখন কিছুই আসে যায় না।। সে খুব সন্তর্পণে চারপাশে কিছু খুঁজছে। আর যেন কান খাড়া করে রেখেছে। মায়া কুকুরের ছানাটাকে কোলে তুলে নিতে গেলে এক ধমক—রাখ বলছি। ঘাঁটবি না। সে বোধহয় কোথাও থেকে বাচ্চাটা চুরি করে এনেছে। সে তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে নিয়ে ঘরের পেছনে চলে গেল। এবং রাস্তা থেকে দূরে আড়াল মতো একটা জায়গায় এসে শেষ পর্যন্ত কিছুটা সে নিশ্চিন্ত হল। বলল, দাদা একটা দড়িটড়ি আন তো।

আমি বললাম, ছেড়ে দে না। ওটুকু বাচ্চা কোথাও আর পালাতে পারবে না।

—ছেড়ে দিলেই চলে যাবে। ওর মাটা ভীষণ পাজি। আমার পেছন পেছন এসেছিল। ঢিল ছুঁড়তেই কোথায় পালাল। ও মা, বাড়ির কাছে এসে দেখছি, আবার মাটা পেছনে।

—কোত্থেকে আনলি?

—বাগদীপাড়া থেকে।

—ওর মাটা কোথায়?

—ঠ্যাঙানি খেয়ে পালিয়েছে। তবু মা তো আবার ঠিক চলে আসতে পারে।

মা তখনও কাজকাম করতে করতে চেঁচাচ্ছিল, পিলু বাচ্চাটা দিয়ে আয়। দুধের বাচ্চা, বাঁচবে না। এটুকু বাচ্চা মা ছাড়া থাকবে কি করে। ঘরে দুধ নেই যে দুধ দেব।

আমারও ইচ্ছে ছিল না—ওটা আবার পিলু রেখে আসে। রাতে যে-ভাবে হাবিলদার লোকটা আমাদের ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেল, তাতে করে পিলুর এমন কাজকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। লোকটা ভয় দেখিয়ে চলে যাবার পর বোধহয় পিলু সারা রাত ভেবেছে কি করা যায়। রাতে বোধহয় ওর ভাল ঘুমও হয়নি বাবা নেই, বাবা মাঝে মাঝে এভাবে থাকে না, বনের অন্ধকারটা তখন রাতে দাঁত বের করে হাসে। যে বনটা দিনের বেলায় পিলুর সঙ্গী রাতে সেটাই কেমন তার শত্রু হয়ে যায়। তারপর চোর-ছ্যাঁচোড়ের মতো যদি আবার সেই বাটপার লোকটা রাতে চলে আসে তখন কি হবে? সে এত সব ভয়ের কথা ভেবেই শেষ পর্যন্ত একজন তার উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে এনেছে।

সে ফিরে এসে ভেবেছিল, কুকুরের এমন সুন্দর বাচ্চাটা দেখে মাও খুব খুশী হবে। কিন্তু মাকে তেমন খুশী দেখাল না বলে সে বেশ মুষড়ে পড়েছে। বাচ্চাটার ভাল করে চোখ ফোটেনি। ঠিকমতো দেখতে পায় না। দুধ না পেলে বাঁচবে না। মা তখনও পাঁচালী পাঠ করে যাচ্ছে—দুধের বাচ্চাটা তুলে নিয়ে এলি, তোর মায়াদয়া বলতে কিছু নেই রে পিলু। মা এমন সব হরবখত বলে যাচ্ছিল। —দিয়ে আয়। এমনিতেই কি পাপে যে পড়েছি, দেশ ছাড়া, দু-মুঠো পেট ভরে খেতে দিতে পারি না—আর পাপ বাড়াস না বাবা। বড় হলে আনবি। যা লক্ষ্মী তো বাবা, দিয়ে আয়।

পিলু এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য ভরসা খুঁজছে। অন্তত একজনও যদি তার এই দুঃসময়ে পিছনে না দাঁড়ায় তবে সে যায়টা কোথায়। মায়া ততক্ষণে কোলে নিয়ে বাচ্চাটাকে আদর করতে বসে গেছে। পেটের কোথায় লুকিয়ে আছে বাচ্চাটা টেরও পাওয়া যাচ্ছে না।

মা রেগে গেলে ভারি মুশকিল আমাদের। সারাদিন পাঁচালী পাঠ চলবে। রাজা শ্রীবৎস থেকে আরম্ভ করে পুরাণের সব দুঃখী মানুষদের গল্প এক এক করে কপালে করাঘাত করার মতো শোনাবে আমাদের।

এ-সব সময়ে আমার মধ্যস্থতা খুব কাজ দেয়। তখন আমি পিলুর পক্ষেও না, মায়ের পক্ষেও না। একেবারে নিরপেক্ষ মানুষ। পিলুকেই প্রথম আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলাম। বললাম, তুই যে আনলি, ওর মা-টা কোথায় থাকে জানিস?

—ঐ যে তোর বড় শিশু গাছটা আছে না, একটা চালতা গাছ, আরে ঐ যে তোর বাগদিপাড়ার মুখে একটা ঝুপসি মতো ছিটকিলার জঙ্গল আছে--বুঝতে পারছিস না, খড়ের গাদা আছে একটা তার নিচে মা-টা থাকে।

বুঝতে পারলাম, বেশ খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। বাদশাহী সড়ক পার হয়ে মাঠের ওপর দিয়ে কিছুটা পথ হেঁটে যেতে হবে। সকালে বিকেলে দুবার দুধ খাওয়ানো দরকার। এবারে মাকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। বললাম, ওর মা-টা কাছেপিঠেই থাকে।

মা বিছানা রোদে দিচ্ছিল। শুনতে পেল কি না কে জানে। বেশ চেঁচিয়ে বললাম, ওর মা-টা কাছেপিঠেই থাকে মা!

—তা কাছেপিঠেটা কোথায়?

—ঐ তো রাস্তাটা আছে না!

রাস্তায় কখনও কুকুর বাচ্চা নিয়ে থাকে? তার বাড়িঘর থাকবে না। বাড়িঘরের কথায় আসতেই বললাম, ব্যারাক বাড়িতে থাকে।

বাড়িঘরের কথা শুনে মা বেশ খুশীই হল। মা বলল, পুলিস ব্যারাকে থাকে বলছিস ?

পিলু চোখ টিপে দিল। বললাম, হ্যাঁ।

কাছেপিঠে যখন থাকে মা-টা তখন আর ভাবনা নেই। মারও বেশ আগ্রহ বাড়ছে বাচ্চাটার জন্য। মা বলল, দু দিন বাদে আবার কেউ না নিয়ে যায়!

মা এবার পুন্নুকে কোলে নিয়ে বাচ্চাটার কাছে এসে বসল। পুন্নু দু-হাতে বাচ্চাটাকে চটকাতে চাইছে। আমরাও তখন গোল হয়ে ফের একজন অতিথি, ঠিক অতিথি বলা চলে না, একেবারে আর একজন এই সংসারের ভেবে আনন্দে মেতে গেলাম। সংসারের আর পাঁচটা কাজের মতো এই বাচ্চাটাকে বড় করার দায়িত্বও আমাদের পড়ে গেল।

পিলু তখন বলল, মা, বাবা সত্যি চিঠি লিখেছে ?

মা বলল, হ্যাঁ লিখেছে। চিঠি লিখেছে, টাকা পাঠিয়েছে।

—কবে আসবে বাবা ?

—তা কিছু লেখেনি। এখন জলপাইগুড়িতে আছে। সেখান থেকে কোথায় আসামে অভয়াপুরী আছে সেখানে যাবে। দু-দশ ঘর শিষ্যের খোঁজ পেয়েছে। আরো পাবে বলেছে। ওদের প্রণামী টাকা সব একসঙ্গে করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বোঝা গেল বাবার ফিরতে আরও মাসাধিককাল।

মা ফের বলল, তোমাদের পড়াশোনা করতে বলেছে মন দিয়ে।

মায়া বলল, আমার কথা কিছু লেখেনি মা ?

—সবার কথাই লিখেছে।

তাছাড়া মার কাছে আরও জানা গেল, বাবা শিলচর কাছাড় হয়ে ফিরবে। দেশ থেকে হরমোহন জ্যাঠামশাইরা চলে এসেছে। আসার সময় হরমোহন জ্যাঠামশায়ের কাছে বাড়ির বিগ্রহ রেখে এসেছিলেন বাবা। বিঘে দুই ভুঁই ঠাকুরের নামে রেখে এসেছিলেন। সব বিক্রি

করে নগদ বাবা যা পেয়েছিলেন, সবটা আনতে পারলে, আমাদের এখানে পাঁচ-সাত বছর রাজার হালে চলে যেত। কিন্তু ঐ তো দোষ বাবার, বাই উঠলে রক্ষা নেই—দেশ ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার এক দণ্ড সবুর সইল না। জলের দরে তারক মাঝির কাছে সব বিক্রি। তাও তারক মাঝি বলল, কর্তা, এত টাকা নিয়ে তো যেতে পারবেন না, দর্শনায় সব কেড়েকুড়ে নেবে। বরং বাকিটা আমি হুণ্ডি করে পাঠিয়ে দেব। সেই দেব বলে আর দিল না। চিঠি দিলে লিখত, সব ফিরিয়ে নিন কর্তা। আমার আগাম টাকা আর আপনাকে ফেরত দিতে হবে না।

বাবা খুব উত্তেজিত হলে বলতেন, তারক আমাকে এমনভাবে ডোবাবে ভাবিনি।

মা বলত, আসলে লোকটা বিষয়ী মানুষ। ধূর্ত। তুমি ওর কথা বিশ্বাস করলে—কত বললাম, নিয়ে নাও। রাস্তায় যা হবার হবে।

বাবা খুব চড়া গলায় বলতেন, মেয়েছেলের বুদ্ধি আর কাকে বলে! রাস্তায় কেড়ে নিলে একেবারেই যেত। তবু তো আশা আছে, তারকের সুমতি হলে টাকাটা পাঠিয়েও দিতে পারে।

—আর দিচ্ছে।

—বামুনের টাকা কেউ মারে!

বাবার এমন ধরনের কথা শুনে শুনে মা শেষ পর্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পারত না। বলত, ছাখো তোমার কি হয়। নিজের ভালটা একটা কুকুর বেড়ালও বোঝে, তুমি তাও বোঝ না। লোকের কথায় কেবল নাচ।

—লোকের কথায় নাচব না, তোমার কথায় নাচব! বাবা তারপর ধৃতরাষ্ট্র থেকে দশরথের কৈকেয়ী পর্যন্ত নির্বিঘ্নে নারীবুদ্ধি সংসারে কত বিপত্তিকর সব উদাহরণসহ এক এক করে তুলে ধরত। আমরা ঐ সময়ে কার কত বেশি রামায়ণ মহাভারতে দৌড় টের পেতাম। বাবা শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হলে মাকে মহারোষে চণ্ডীপাঠ আবৃত্তি করে

শোনাতেন। মার হাজার কথার এক বর্ণও আর যেন কানে না ঢোকে। বলতেন :

যা দেবী সর্বভূতেষু সৃষ্টিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

মা তখন আমার আরও রেগে যেত। চেঁচিয়ে বলত, তোমার বুদ্ধিনাশ হয়েছে। তোমার মতিভ্রংশ হয়েছে। তুমি আমাকে আর কত জ্বালাবে। হাড় মাস তো কিছু আর রাখনি। সব গেছে আমার।

বাবার চণ্ডীপাঠ তত দ্রুত বাড়ত। প্রায় পাল্লা দেবার মতো, কেউ কম যায় না, একদিকে বাবার উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ অন্য দিকে মায়ের সারাজীবনের জ্বালা সারা বাড়িটায় তখন খোল-করতাল সহ হরিসংকীর্তনের মতো। আর আমরা তখন একেবারে স্বাধীন নাগরিক। খুশিমতো পেলে খাই, না পেলে খাই না, যা পাই তাই খাই। উদাহরণ দেবার মতো স্বাধীন নাগরিক অধিকার রক্ষা করে যাচ্ছি। যেখানে সেখানে চলে যেতে পারি।

এখন সে-সব খণ্ড-যুদ্ধের মলিন দিনগুলি আর ভাসে না চোখে। বাড়িঘর হয়ে যাওয়ায় আমরা মা বাবার খুবই অনুগত হয়ে উঠেছি। মা দেখছি সব কিছু সময় মতো মনে করিয়ে দেয়। টাকাটা দিয়ে মোটামুটি আমাদের বেশ কিছু দিন খুব ভালভাবে চলে যাবে বলে, একটা হিসাবপত্রও হয়ে গেল। এক মণ চাল, সতের টাকা দশ আনা, মায়ার ফ্রক, তিন টাকা ছ আনা, পিলু এবং আমার প্যাণ্ট সার্ট সাত টাকা চোদ্দ আনা, বাকি টাকায় মজুত ভাণ্ডার গড়ে উঠবে—এত সব পরিকল্পনার পর মা মনে করিয়ে দিল, মনার দুধ খাবার সময় হয়ে গেছে, কৈ রে পিলু যা বাবা, দেখ ওর মা-টা কোথায় আছে, একটু দুধ খাইয়ে আন।

তখন হয়ত সকালের রোদ উঠে গেছে। আমরা দু ভাই সেই নেড়ি কুকুরটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোলে তুলোর বলের মতো

বাচ্চাটা চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। কোথাও নেড়ি কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না। আস্তানায় নেই। মাঠঘাট এবং গাছপালার অভ্যন্তরে কুকুরের আভাস পেলেই ছুটছি। আস্তানায় অন্য বাচ্চাগুলি সারারাত দুধ খেয়ে অঘোরে জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে। মনা রাতে দুধ খায়নি। ভোর রাতে কেঁদেছে। খিদেয় মাঝে মাঝে কোলের মধ্যে কোঁ কোঁ করেছে। সারারাত মনা থাকে পিলুর লেপের নিচে। তারপর কিছুদিনের মধ্যে পিলু বনবাদাড়ে গেলে বাচ্চাটাও যায়। পিলু ঘাটে গেলে বাচ্চাটাও হেলতে দুলতে চলতে থাকে। পড়তে বসলে দু পা সামনে রেখে হিজ মাস্টারর্স ভয়েস হয়ে যায়। কান খাড়া রেখে আমাদের পড়াশোনা মন দিয়ে শোনে। আমরা তখন আরও মনোযোগী ছাত্র হয়ে যাই বাচ্চাটার জন্য। মা বাটিতে করে সবার জন্য ভাগে ভাগে তেল পেঁয়াজ মাখা মুড়ি রেখে যায়। পুনু বারান্দায় উঠোনে হেঁটে বেড়ায় তখন। কখনও হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যায়। আমরা মুড়ি খাই, পড়ি। মনা মুড়ি খায়, পড়া শোনে। পুনু মা মা করে তখন ফ্যাক করে কাঁদে। আর তখনই মায়ার পড়া থেকে ছুটি—সে পড়ার চেয়ে ভাইকে আদর করা, কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সংসারে বেশি দরকারী কাজ মনে করে থাকে। মারও বোধহয় এতে সুবিধা হয়। মায়া পড়ছে না বলে আর বাড়ির কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। পিলু এতটা সহ্য করতে পারে না। সেও পড়া ফেলে তখন উঠে পড়ে এবং কুকুরের বাচ্চাটার সঙ্গে তু-তু খেলা শুরু করে দেয়। পড়া ছেড়ে উঠে পড়ার আমার কোনো অছিলাই থাকে না। মনটা ঘরবাড়ির উপর বেজায় ক্ষেপে যায়।

মাস শেষ হতে না হতেই বাচ্চাটা সেয়ানা হয়ে গেল। অচেনা ঘ্রাণে চিৎকার করে উঠতে শিখে গেল এক সময়। গাছ থেকে পাতা পড়লে দৌড়ে যায়, কোনো শব্দ পেলে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। রাস্তায় লোকজন দেখলে তাড়া করে যায় মানুষকে।

বনভূমির অভ্যন্তরে আমাদের বাড়িটার প্রায় রক্ষাকারী বাচ্চাটা। বাচ্চাটারও নিজস্ব একটা নাম হয়ে যাওয়ায় বিলু, পিলু, পুন্নুর মতো সে সংসারে বেশ একজন হয়ে গেল। —মনা কোথায়, মনাকে খেতে দে। তোরা স্নান করতে যাচ্ছিস, মনাকে নিয়ে যাস। গায়ে খুব ময়লা পড়েছে।

আমার মা সবার সঙ্গে মনার ভাল মন্দ নিয়ে ভাবে। যা শেয়ালের উপদ্রব, কিছুতেই রাতে বাইরে রাখা নিরাপদ নয়। সে ঘরেই থাকে রাতে। আর যখন তখন এলোপাথাড়ি চিৎকার! মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে পিলু উঠে পড়ে কান মুচড়ে দিয়ে বলে, হয়েছে। খুব হয়েছে। এখন ঘুমোতে দে।

আসলে বোধহয় কুকুরটার রাতে লেপের তলায় থাকা অভ্যাস ছিল বলে নিচে একা থাকতে কিছুতেই রাজী না। ক্ষোভে দুঃখে বোধহয় সারারাত ঘেউ ঘেউ করত। তারপর একা থাকা অভ্যাস হয়ে গেলে আর কুঁই কুঁই করত না। সত্যিকারের ঘ্রাণ টানে সে যখন ভাল মন্দ বুঝতে শিখে গেল, তখনই এই ঘরবাড়ির আসল চোরের ঘ্রাণ পেয়ে একদিন গভীর রাতে ত্রাহি চিৎকার। আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। দরজায় সত্যি খুট খুট শব্দ করছে কে। মাও উঠে পড়েছে। লম্ফ জ্বেলে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর কুকুরটা একেবারে লাফিয়ে, সত্যি বাঘা কুকুর, বাঁচলে হয়—না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, আচড়ে কামড়ে ফালা ফালা করে দিতে চাইছে খলপার দরজা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কে কথা বলছে, কি বলছে, বোঝা যাচ্ছে না। তখন মা আমার না পেরে অত্যন্ত সরল গলায় বলছে, থাম বাপু, খুব হয়েছে। আলো হাতে মা দরজা খুলে দিলে দেখলাম, বাবা আমার ফিরে এসেছেন। হাতে কাঁধে কত সব ছোট বড় মাঝারি পোঁটলা-পুঁটলি। আর তখনই বুঝি পিলুর মনে হল, কুকুরের স্বভাব কামড়ানো। যে-ভাবে বাবার দিকে একবার এগোচ্ছে পিছোচ্ছে, কখন না কামড়ে দেয়। সে প্রায় সার্কাসের রিং মাস্টারের মতো

কুকুরটাকে গম্ভীর গলায় বলল, এদিকে এস। আমার বাবা। বেয়াদবি করবে না।

কে কার কথা শুনছে! কুকুরের বাচ্চটা পিলুকে আমলই দিচ্ছে না। বাবাও খুব বিব্রত বোধ করছেন। গলায় আবার একটা গামছা বাঁধা বাবার। গামছার মধ্যে ভারি কিছু পাথরটাথর ঝুলছে গলায়। একটা বড় সাইজের মাদুলির মতো লাগছিল পুঁটলিটাকে। এক গাল দাড়ি। বাবাকে ঠিক চেনাই যাচ্ছে না। পিলুর মতো কুকুরের বাচ্চাটাকে সাহসের সঙ্গে বলতে পারছিলাম না—হ্যাঁরে আমাদের বাবা। সত্যিকারের বাবা। একা পিলু বললে কুকুরের বাচ্চাটা বিশ্বাস করবে কেন!

পিলু ফের গম্ভীর গলায় বলল, মনা ভাল হচ্ছে না। বাবা কত দূরদেশ থেকে এসেছে। বাবাকে বসতে দাও।

বাবাও কুকুরটাকে দেখে ভারি ভীতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। এক পা এগোচ্ছে না, পিছোচ্ছেও না। কি বলবে যেন ঠিক করতে পারছে না। আর গলায় যা আছে সেটাও একটা যেন বাবার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তখন আমি বললাম, এই মনা, আমার বাবা, সত্যিকারের চোর-ছ্যাঁচোড় না। থাম বলছি।

তবু যখন থামল না, পিলু বেজায় চটে গেল। রিং মাস্টারের মতো ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ধাঁই করে ফুটবলের মতো সজোরে লাথি, বেশ উঁচুতে উঠে টপকে পড়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে লেজ গুটিয়ে কুঁই কুঁই করতে করতে ঘরের কোণায় গিয়ে বসে পড়ল। বাবা বললেন, আহা মারছিস কেন, ওর কি দোষ। না বলে না কয়ে এসছি, চোর-ছ্যাঁচোড় তো ভাববেই।

বাবার দিকে তাকিয়ে মা আর একটা কথাও বলতে পারছিল না। বাবার চেহারাটা সত্যি খুব খারাপ হয়ে গেছে যেন। খুব বড় অসুখ-বিসুখ থেকে উঠলে যেমন দেখায়—লণ্ঠনের আলো তুলে

বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে মা। তখন ক্ষীণ গলায় বাবা বললেন, একটা মাদুর পেতে দাও। বিছানায় বসব না। গলায় ব্রহ্মাণ্ড।
মা ঠিক বুঝতে না পেরে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করল কথাটাতে। বলল, তোমার কিছু হয়েছে ?
—আরে না না।
—বড় অসুখ-টসুখ ? তারপরই বুঝি মনে হয় মার, বাবা আর দু দণ্ড দাড়িয়ে থাকতে পারবেন না। মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। তাড়াতাড়ি মাদুর পেতে বলল, বোস।
বাবা নিস্তেজ গলায় বললেন, জল দাও। তিন দিন থেকে জল খেয়ে আছি। আজও থাকতে হবে। নিরম্বু উপবাস করতে ভরসা পেলাম না। সবই তাঁর ইচ্ছে। এবং গলায় এত বড় পুঁটলিটা নিয়ে বাবার কতটুকু অস্বস্তি হচ্ছিল জানি না, কিন্তু আমাদের কেমন হাঁসফাঁস লাগছিল। বললাম, বাবা ওটা খুলে ফেল। ওতে কি আছে ? বাবা বললেন, ওতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে।
বাবার হেঁয়ালি বুঝতে না পেরে পিলু বাবার মুখের ওপর ঝুঁকে বলল, কি বললে বাবা ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড !
—হ্যাঁ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। বলছি না বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—বুঝলে ধনবৌ, আর রাত জেগে কি হবে, নিচে শুয়ে থাকছি। সকালে তোমাদের কাজের অন্ত থাকবে না। লোকজন ডাকতে হবে।
আমরা বাবার কথায় খুবই ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম। লোকজন ডাকতে হবে কেন ! কিছু একটা তবে সকালে হচ্ছে। সেটা কি—কিন্তু বাবা একে নিস্তেজ তায় আবার গম্ভীর, গলায় গামছা ঝুলিয়ে তদুপরি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বয়ে বেড়াচ্ছে—সুতরাং কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতো আমাদের রা সরছিল না।
মা কেমন অসহায় বালিকার মতো কেঁদে ফেলল। বলল, কি হয়েছে বলবে তো ?
বাবার মুখে সুমধুর হাসি ফুটে উঠল। বললেন সব। কোথায়

হরকুমার জ্যাঠারা বাড়ি করেছেন, কোথায় দাত্বর শিষ্যরা কে কি ভাবে বেঁচে আছেন, কে কত টাকা দিয়েছে—সব। হরকুমার জ্যেঠার কাছ থেকে বাড়ির গৃহদেবতা চেয়ে নিয়ে এসেছেন। ছুটো রাধাগোবিন্দের মাঝারি সাইজের পেতলের মূর্তি, শালগ্রাম-শীলা—এবং ওজনে সের দশেক হবে তেনারা গলায় ঝুলছেন একটা ছোট মাপের ঢোলের মতো। তিন দিন তিনি অনাহারী, গলায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঝুলিয়ে আহার করেন কি করে। কালই দেবতাদের জন্য ঠাকুরঘর উঠবে। সকালে সবাইকে তুলে নিয়ে যাবেন নদীতে। গঙ্গাস্নান করবেন। ভিজে কাপড়ে ফিরে আসতে হবে সবাইকে। ছুলে-বাগদিকে ডাকতে হবে। সে তালপাতা দিয়ে ছোট মতো ঠাকুর ঘর বানাবে, ১লা বৈশাখ ঠাকুরের অভিষেক। লোকজন খাবে, চণ্ডী পাঠ হবে। ছু-দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন। এতসব শুনে আমরা হাঁ হয়ে গেছি। কুকুরের বাচ্চাটাও লেজ নাড়ছে। আনন্দ প্রকাশের কোনো ভাষা আমাদের জানা নেই। শুধু নিঝুম এক অন্ধকারে এই বাড়িঘর বড় বেশি সজাগ হয়ে উঠেছে। আর আমার মনে হল আজ থেকে আকাশের ছোট একটা নক্ষত্র সারাক্ষণ রাতে বাড়িটার মাথায় পাহারায় থাকবে। বাড়িটার ভেতর কোনো ছুঃখ ঢুকতে দেবে না। বাবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা তালপাতার ঘরে, সত্যি ভাবা যায় না! জীবনে কত বড় সুখ কত সহজে বাবা আমাদের জন্য মাঝে মাঝে যে নিয়ে আসে!

॥ আট ॥

সকালে ঢাকের বাদ্যিতে বনভূমিটা জেগে গেল। ঠাকুরের নতুন ঘর উঠেছে। ছু বান টিন কিনে এনেছেন বাবা। এক বান টিন দিয়ে ঠাকুরের দোচালা ঘর, বাঁশের চাটাই-এর বেড়া। ছোট্ট একটা কাঠের সিংহাসনও রাজু মিস্ত্রি বানিয়ে দিয়ে গেছে।

বাবা ফেরার পর এ'কটা দিন আমরা দিনের বেলায় দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে বাবা কথাবার্তায় সাধু ভাষা প্রয়োগ করলে টের পেতাম, বসে থাকার সময় আর নেই। শুধু কাজ। কাজই মানুষকে বড় করে দেয়। সুতরাং লিস্টি মিলিয়ে সওদা এল শহর থেকে। জীবনে প্রথম বাবার সঙ্গে রিক্সয় চড়ে সওদা করে ফিরলাম। অবশ্য এই নিয়ে একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল—রিক্সয় ফিরব শুনে পিলু এবং মায়া বায়না ধরেছিল, তারাও যাবে। কিছুতেই যখন বাবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না, তখন কথা দিতে হল, একদিন বাবা ওদের দুজনকে নিয়ে রিক্সয় চড়বে। এবং যখন ফিরলাম, আমার সৌভাগ্যে পিলু ভীষণ হতাশ গলায় বলল, সে কোনো কিছুই বাড়ি অবদি বয়ে নেবে না। বড় রাস্তা থেকে বেশ দূরে বাড়িটা—বড় বড় ব্যাগ, চালের বস্তা। এবং আলু, পটল, ঝিঙে, আতপ চাল, মুগের ডাল, সব মিলে একটা বেশ বড় রকমের উৎসবই বাবা যখন করছেন, তখন পিলুর এই বাঁদরামো আমার কাছে ভীষণ অসহ্য ঠেকল। ইচ্ছে হল বলি, তোর ঘাড় নেবে, কিন্তু পিলুকে জানি বলেই অমন রূঢ় গলায় কিছু বলতে সাহস হল না।

বাবা রিক্স থেকে নেমেই বললেন, পিলু ধর বাবা। ব্যাগটা ধর, পিলু যখন ভাল করে চেয়ে দেখল, রিক্স ভর্তি—ছোট বড় ব্যাগ, হাড়ি পাতিল, চালের বস্তা, তখন সে আর স্থির থাকতে পারল না। ব্যাগ নিয়ে দৌড়ল। আমিও দুটো ব্যাগ নিয়ে ফিরলাম। মায়া খবর পেয়ে ছুটে এল বড় রাস্তায়। সে হাড়ি পাতিল যতটা পারল নিল। বাবা বাকিটা। চালের বস্তাটা রিক্সওয়ালা মাথায় নিয়ে যখন এল মা তখন গাছের নিচে বাড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

ক'দিন ধরে বাবা পড়াশোনার কথা একদম বলছেন না। কুল-দেবতাকে নিয়ে এসেছেন, এবং কত বড় ভরসা এখন তার এই

বাড়িতেই আছে, ছেলেরা এখন ঠাকুরের কৃপাতেই সব পার হয়ে যাবে। বাবার কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছিল, মাথায় তার ঠাকুরের অভিষেক ভিন্ন অন্য কোনো ভাবনা নেই। ঠাকুরঘর, তেপায়া দুটো, তামার পাত্র, কোষাকুষি, পেতলের থালা দুখানা—গজ খানেক নতুন গরদ এবং লাল সিল্ক অর্থাৎ ঠাকুরের পোশাক-আশাক, তারপর শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসি, একটা জল-শঙ্খ দরকার—বাবা সারাক্ষণ মার সঙ্গে পরামর্শ করছেন, আর কি লাগবে খ্যাখো। কিছু বাদ গেল না তো।

মা কি বলবে। একেবারে মুহ্যমান মা। মানুষটা ঈশ্বর ভরসা করে আছে, তার ঈশ্বর দুটো পয়সার মুখ দেখিয়েছেন। তিনি দিচ্ছেন। এবং মার কাছে বাবা একসময় সবই খুলে বললে, মা বলল, শেষ পর্যন্ত দেবে তো।

—দেবে না কেন? ওরাই তো বলল, কর্তা, বাড়ির ঠাকুর, বাড়ি নিয়ে যান। আমরা তো আছি। ঈশ্বরের সেবায় কিছু দিলে পুণ্যটা আপনার হবে না। আমাদের হবে।

এবং বোঝা গেছিল আমার দাদুর বড় বড় শিষ্যদের বাবা ঠিক খুঁজে বের করেছেন। দেশের সব যজমান, কে কোথায় আছে খুঁজে খুঁজে বের করেছেন। কেউ বোধহয় বাদ যায়নি। তারাই বাবাকে ঠাকুরের নামে মাসোহারা পাঠাবে বলেছে। এবং সঙ্গে যে কিছু দিয়েও দিয়েছে খরচ-পত্তরের বহর দেখেই তা আমরা টের পচ্ছিলাম।

কে কে খাবে, তারও একটা লিস্টি হয়ে গেছে। মানুকাকা আসবেন, ছেলেরা মেয়েরা আসবেন তাঁর। নিবারণ দাসের বাড়িতে সবাইকে বলা হয়েছে। শহর থেকে আসবেন দুজন পণ্ডিত। বাবা এ-সব ব্যাপারে মানুকাকার পরামর্শ ছাড়া চলেন না। এবং সকালে উঠে পিলু চলে গেছে গোবর আর ষাঁড়ের চনা সংগ্রহ করতে। দুটো বড় গর্ত করা হচ্ছে উনুনের জন্য। মা ঘর, দরজা, উঠোন লেপে বাড়িটাকে ঝকঝকে করে তুলেছে। পুন্নুও বুঝেছে বাড়িতে কিছু

একটা হচ্ছে। সে বেশ একা একাই খেলছিল। আর ঢাকের বাদ্যি বাজতেই মায়া পুন্নুকে কোলে নিয়ে ঢাকির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আর বেশ বাজাচ্ছিল লোকটা। ঘুরে ঘুরে আর নেচে নেচে বাজাচ্ছিল। কাঁসি বাজছিল ট্যাং ট্যাং করে। দুলে বাগদি খুব খাটছে। সে-ই প্রায় এক হাতে সামিয়ানা টাঙিয়েছে—সকালেই সব লোকজন চলে আসবে। তাদের বসার জায়গা চাই। এবং আমাদের পরিবারে এমন একটা দিন আসবে আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি। নিবারণ দাস এলে বলেছিলেন বাবা, দাসমশাইকে বসতে দে।

—তা হলে কর্তা সব ঠিকমতোই হয়ে যাচ্ছে।

বাবা নতুন ধুতি পরেছেন। দুলে তামাক সেজে দিচ্ছিল। কে বলবে, আমরা এখানে এসে একটা প্ল্যাটফরমে পড়ে থেকেছি দিনের পর দিন। কি করে যে মানুষ তার বাড়িঘর ঠিক এক সময় বানিয়ে ফেলে। বাবার হয়ে আজ নিবারণ দাস সব দেখাশোনা করবে। কারণ বাবা তো সারাটা দিন ঠাকুরঘরেই থাকবেন। এবং নিবারণ দাস বেশ নিজের বাড়ির লোকের মতো বলল, কর্তা মা, উনুনে কটা কাঠ ফেলে দিই। আগুন ধরিয়ে দিই। কাকিমা এলে মা বঁটি দিয়ে বলল, বসে যা নেরু। বলে আলু পটলের ঝুড়ি এগিয়ে দিল মা। নিবারণ দাসের লোক গেছে বাজারে। সে পছন্দমতো মাছ কিনে আনবে বলেছে।

এক একজন আসছে আর আমি পিলু মায়া হৈ-চৈ করে খবর দিচ্ছি বাড়িতে। মা আরতিদিরা আসছে, মা সুজয়দারা আসছে। যাদের চিনি না, বাবাকে বলছি ঠাকুরঘরে গলা বাড়িয়ে—বাবা কে এসেছেন ছাখো। এবং বেশ বোঝা গেল বাবা এখানে আসার পর পরিচিত ব্যক্তি বলতে আর কাউকে বাদ রাখেননি। যেখানে যার সঙ্গে দু দণ্ড কথা হয়েছে, পরিচয় হয়েছে, সুখ-দুঃখের দুটো কথা হয়েছে তারা সবাই আজ আমাদের উৎসবে আমন্ত্রিত।

দুপুরের মধ্যেই বাড়িটা লোকজনে ভরে গেল। দুলে রাশি রাশি

কলাপাতা কেটে রেখেছে। পিলু মায়া কলাপাতার মুখোস পরে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে। কাক-পক্ষিদেরও যেন জানতে বাকি নেই। সবাই টের পেয়ে গেছে আজ আমার বাবা তার কুলদেবতার অভিষেক করছেন। সারা রাস্তায় রেলগাড়িতে ঠাকুর গলায় ঝুলেছে—বাছ-বিচার কিছু ছিল না, শোধন করে নিচ্ছেন সে-জন্য।

নিবারণ দাসের বড় মেয়ে আরতি এসে বলল, সাধন মামা আসছে। বড় ঝুড়িতে বিরাট একটা রুই মাছ। সবাই রাস্তায় ছুটে গেছি। মাছটা নামালে আমরা ঘিরে বসলাম। পিলু খুঁটে ছুটো আঁশও তুলে ফেলল। সাধনদা নিবারণ দাসের শ্যালক। সে বড় বঁটি নিয়ে এল। মাছ কাটা দেখার জন্য আমাদের উৎসাহের শেষ ছিল না। বড় গামলা কেউ টেনে আনছে। কেউ ড্রামে জল ভর্তি করছে। রান্না হচ্ছে ছুটো বড় উনুনে। মুগের ডাল, তিতের ডাল, বেগুন ভাজা, শাক হয়ে গেলে সব মা আর কাকিমা ঘরে নিয়ে সাজিয়ে রাখছে।

তখনই পিলু বলল, মা নবমীর জন্য ছুটো ভাত নিয়ে যাব। সবাই খাবে, এই বনভূমির কাক পক্ষিরাও যখন বাদ যাচ্ছে না, তখন নবমী খাবে না সে হয় না। পিলু বোধহয় সেই ভেবে কথাটা বলেছে।

অন্যদিন হলে নিজেই দেওয়া যাবে কি যাবে না মা সাফ বলে দিতে পারত। সংসারে আমার মার ওপর আর কারো কোনো কথা নেই, কিন্তু মা কেন জানি আজ বড় বেশি বাবার অনুগত। বলল, তোর বাবাকে বলে দেখ কি বলে।

পিলু ঠাকুর ঘরের দরজায় এসে বলল, বাবা নবমী কতদিন কিছু খায়-নি। ছুটো ভাত দিয়ে আসব?

বাবা তখন তদ্গদচিত্তে ঠাকুরের দিকে তাকিয়েছিলেন। কেমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য মানুষ। পিলুর মনে হল বাবা ইচ্ছে করেই তার কথা শুনছেন না। এবং এ-সব সময়ে পিলুর যা হয়, মেজাজ চড়ে যায়, সে হেঁকে ডাকল, বাবা!

বাবা ঘাড় ফিরিয়ে পিলুকে দেখল।

—নবমীকে দুটো খেতে দেব ?

বাবা বললেন, নবমী !

—ইঁটের ভাটার ওদিকটায় একটা বুড়ি থাকে না !

—দাও। যখন ইচ্ছে হয়েছে দেবে বৈ-কি ! সংসারে সাবাই খাবে, নবমী খাবে না সে কি করে হয়।

আশ্চর্য এক সুঘ্রাণ। ফল বাতাসা, ধূপ দীপের গন্ধে বাড়িটা ভরে আছে। সকালে মা বাড়ির আঙিনায়, ঠাকুরঘরের মেঝেতে আলপনা এঁকে দিয়েছিল। মানুষজনের হাঁটাহাঁটিতে সব মুছে যাচ্ছে। ঠাকুরঘরে পূজা-আর্চা চলছে সেই কখন থেকে, ঢাকের বাদ্য বাজছে সেই কখন থেকে। বাবা কাপড়ের খোট থেকে এটা ওটা আনার জন্য মাকে টাকা পয়সা বের করে দিচ্ছিল কখনো। সাধন এবং মানুকাকা এবং আর যারা যারা এসছে সবাই প্রণিপাত হচ্ছে, ধূলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে। নিবারণ দাস কিছুক্ষণ ঠাকুরঘরের বাইরে থম মেরে বসেছিল। দেব-দেবীর মুখ দেখতে দেখতে কখনও মা মা বলে চিৎকার দিয়ে উঠছিল। কেউ কেউ বাবার বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখছে। আশ্রমের মতো মনে হচ্ছে, একটা আগাছা নেই, জমি উঁচু নিচু নেই—দুটো চারটা ফলের গাছ মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে আকাশে।

কুকুরটা আরও বড় হয়েছে। মানুষজন দেখে প্রথমে ক্ষেপে গিয়েছিল, পরে বোধহয় বুঝতে পেরেছে—ওরা বাড়িরই লোক, কিছু আর বলছে না। লেজ নাড়ছে আর পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করছে। মাঝে মাঝে পিলুর খবরদারি, ওদিকে যাবে না। এদিকে এস। ওখানে রান্না হচ্ছে। কথা না শুনলে বেঁধে রাখবে ভয় দেখাচ্ছে।

এত সবের মধ্যে সবই হয়ে যাচ্ছিল। সামিয়ানার নিচে সতরঞ্চ পাতা। বাবা সবাইকে ঠাকুরঘর থেকেই বসতে বলছে। বিকেল হলেই খেতে বসবে সবাই। দূর দূর থেকে যারা এসেছে সন্ধ্যার মধ্যেই রওনা হয়ে যাবে। দুটো প্যাট্রোম্যাক্স আনিয়ে রেখেছে নিবারণ দাস। বড়

আপনজনের মতো সে কোনো কিছুর ত্রুটি রাখছে না।

এবং নিবারণ দাসই বলল, কর্তা, পুজো শেষ হতে আর কত দেরি?

বাবা বললেন, এর শেষ নেই দাসমশাই। যতদিন আছি ততদিন শুধু তাঁর সেবা করে যেতে হবে।

ধার্মিক মানুষের কথাবার্তা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবা এবং অন্য সকলের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারতাম, জীবনে সব কিছু বলতে আমার বাবা এর চেয়ে বেশি কিছু বোঝে না। বাবা এতদিন একটা ছিন্নমূল, ছন্নছাড়া মানুষ ছিলেন। এই বাড়িঘর এবং দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা করে বাবা ফের তার শেকড়-বাকড় মাটিতে ছড়িয়ে দিতে দিতে কখন দেখি বাবার মুখে ভারি প্রসন্নতা বিরাজ করছে। বাবার এমন সুন্দর মুখ কখনও আর এর আগে দেখিনি। অকারণে আমার চোখ দুটো জলে ভার হয়ে এল। বাবার মুখ দেখে এই প্রথম বুঝি টের পেলাম জীবন কত বড়।

॥ নয় ॥

বাড়িতে ঠাকুরের অভিষেক হয়ে যাবার পর গাছপালা বনের মধ্যে আমাদের অনেকটা ভয় কেটে গেল। কাছেপিঠে নতুন আবাস এখনও তেমন গড়ে ওঠেনি। তেমনি মাঠ পার হলে পুলিসের ব্যারাক, কালীর দীঘি, বাদশাহী সড়ক—কেবল সেই চৌমাথায় নিমতলার কাছে নিবারণ দাসের বাড়ি এবং তার আশেপাশে আরও সব বাড়ি উঠছে। নতুন কলোনির পত্তন হচ্ছে। সাপ-খোপের উপদ্রব তেমন একটা কমেনি। বৈশাখ শেষ না হতেই জ্যৈষ্ঠ। খরা। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর, মাঠ-ঘাট ঘাস সব হেজে গেছে। মাটি ফেটে চৌচির। মনে হত দুপুরটা এক গনগনে আঁচের আগুনের কুণ্ড। এরই মধ্যে পিলু কোথা থেকে কোঁচড় ভর্তি করে আম সংগ্রহ করে আনত। ঝড় বৃষ্টি রোদ্দুর সবই সে সহজে সহ্য করতে পারে।

এখন এই বাড়িতে আমার বাবার সাধ বলতে আর কিছু ফল-টলের গাছ লাগানো। পাঁচ বিঘে জমির সবটা এখনও সাফ হয়নি। উত্তরের দিকে একটা বড় জঙ্গল রয়েই গেছে। বছরের ওপর হল আমাদের এই নতুন আবাস। এখন আর এ জায়গাটাকে মনেই হয় না অচেনা-অজানা, ভূতুড়ে সাপখোপ অথবা শেয়াল-খাটাশের একমাত্র আস্তানা। ঠাকুরঘরটা হয়ে যাবার পর বাবা একদিন দুটো জবা ফুলের ডাল নিয়ে এলেন। তিনি গেছিলেন বেলডাঙার কাছে মহুলা গাঁয়ে। নিবারণ দাসের বড় শ্যালকের বিয়ে। বিয়ের কাজ সেরে ফেরার সময় দুটো জবা ফুলের ডাল সঙ্গে এনেছেন। বিয়ে দিয়ে পেয়েছেন প্রণামীর টাকা আর একটা পুরোহিতবরণ। কিছু চাল-ডাল। অন্য সময় বাবা যখন এ-ভাবে ফিরে আসেন তখন উপার্জনের নিমিত্ত কতদূর যেতে হয়, এমন সব সাধুবাক্য সংকল্পের মতো পাঠ করেই থাকেন। এবারে অন্য রকম। সব কোনো রকমে নামিয়ে রেখে হাঁকতে থাকলেন,—ও ধনবৌ, তোমার সুপুত্ররা সব কোথায়? কাউকে দেখছি না। বাবা ফিরেছেন বিকেলে, তখন কী আর বাড়ি থাকা যায়। এবং বাড়ির পাশে, কোথাও কোনো বাড়ি ছিল না বলে, শুধু বন-জঙ্গল ছিল বলে, বনের গাছপালা, লতাপাতা, সরু পথ, বুনো ফলের সন্ধান অথবা কোথায় এখন একটা এই গভীর বনে লিচু গাছ আবিষ্কার করা যায় সেই নেশায় বিকেল হলেই আমি পিলু কখনও মায়া সঙ্গে থাকত—বের হয়ে পড়তাম, কারণ আমরা কয়েকবারই এমন কিছু আবিষ্কার করেছি এই বড় বনটাতে যাতে বাবা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। এবং আমাদের কাছে বাবাকে স্তম্ভিত করার আনন্দ ছিল পৃথিবী জয় করার মতো। বাবা দু'দিন বাড়ি নেই, বাবা ফিরে এলে তাঁকে নতুন কোনো খবর দিতে পারব না, সেটা কেমন আমাদের কাছে খারাপ লাগত। এটা লিচুর সময়। আম, কাঁঠাল, লিচু, গোলাপজাম, জাম, জামরুল সবই এ সময়টাতে হয়। কাঁঠাল গাছ এবং দুটো আনারসের গাছ প্রথম

আবিষ্কার করেছিল পিলু। আমি একবার একটা সরু পথ ধরে যাবার সময় প্রথম একটা আম গাছ তারপর আরও বনের গভীরে ঢুকে গেলে বুঝলাম, ওটা আমেরই বাগান, তারপর পিলু খবর নিয়ে এল বনটায় একটা বাতাবী লেবুর গাছও আছে, তখন আমি আর কি আবিষ্কার করব—একটা বাঁশ বাগানের মধ্যে যে ছোট্ট ঢিবি ছিল, একটা বড় গর্ত ছিল, সেখানে একটা কচ্ছপ আবিষ্কার করে এসে বাবাকে খরবটা দিলাম। বাবা বাড়ি না থাকলে যথার্থ স্বাধীন, খাও-দাও ঘুরে বেড়াও। তারপর মায়া আমি কখনও কোনো গভীর বনের মধ্যে ঢুকে নিরিবিলি গিমা শাক খুঁজে বেড়াই। বাবা আমার খুব গিমা শাক খেতে ভালবাসেন।

এ-হেন দিনে বাবা বাড়ি ফিরে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের তাঁর স্বগৃহে উপস্থিত থাকতে না দেখে খুব ক্ষেপে গেলেন। মাকে বোধহয় দুটো মন্দ কথাও বলে ফেললেন। আগের মতো আর তো মার প্রতি বাবার শংকাভাবটা নেই। নানা জায়গায় ঘুরে বাবা তাঁর খেরোপাতার লিস্টি মিলিয়ে সব যজমান এবং শিষ্যদের পুরো একটা তালিকা রচনা করে ফেলেছেন। এ-দেশে আসার পর দুটো বছর লিস্টি ঠিক করতেই চলে গেছে। যে-জন্য বাবা আমাদের অচেনা প্ল্যাটফরমে, অথবা কোনো ভাঙা মন্দিরে ঠাই করে দিয়ে মাঝে মাঝেই নিরুদ্দেশ হতেন। তখন কি খাব কি খাব না তিনি আদপেই সেটা ভাবা পছন্দ করতেন না। ঈশ্বর, পৃথিবী, জলবায়ু এবং লতাপাতা যখন আছে সংসার ঠিক একভাবে না একভাবে চলে যাবেই। অকম্মা মানুষেরাই এটা ভেবে থাকে এবং বাবা মার কাছে এজন্য ফিরে এসে খুব ভালমানুষ সেজে থাকতেন। মা যত গালমন্দই করুক, রা করতেন না।

এখন আমাদের অবস্থা ফিরে গেছে, মা'র এবং বাবার আচরণে এটাই মনে হত। এবং অবস্থা ফিরে যাওয়ার মূলে বাবা, তিনি তাঁর গাছের শেকড়-বাকড় 'সত্যি মাটিতে এবার পুঁতে দিতে পেরেছেন। বনের

শাক, কচু লতাপাতার ওপর আর যেহেতু সংসারটা নির্ভরশীল নয়, তখন তাঁর ছেলেমেয়েরা যখন-তখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে, বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াবে, এটা তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। বাবা জবা ফুলের ডাল ছুটো নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। ঠাকুরঘরের পাশে লাগাবেন, না একটি সুন্দর ফুলের বাগান তৈরি করবেন, ফুলের বাগান তৈরি করতে হলে এলোমেলোভাবে লাগালে চলবে না। ক'হাত বাই ক'হাত বাগানটা হবে, ঠাকুরঘর থেকে কতটা দূরে হবে, রাস্তা থেকে কিভাবে বাগানের সবটা দেখা যাবে এ-সব ভাবনায় পীড়িত হচ্ছিলেন। তাছাড়া যার ওপর ভরসা করে সব তিনি লাগাবেন, সেই মেজ পুত্রটি এখন বাড়ি নেই। মেজ পুত্রটি তাঁর তো পুত্র নয় সাক্ষাৎ দেবতা। পছন্দমতো জায়গায় গাছ লাগানো ঠিক না হলে তিনি সেটি তুলে তাঁর পছন্দমতো জায়গায় লাগাবেন। তাতে গাছ বাঁচুক-মরুক কিছুই আসে-যায় না। আর কাজটি এমন নিখুঁত সতর্কতার সঙ্গে করা হবে যে বাড়ির কাক-পক্ষিটি পর্যন্ত টের পাবে না। এভাবে দামী দামী কটা গাছের চারাই তিনি বিনষ্ট করেছেন। সুতরাং বাবার সমস্যার শেষ নেই। তিনি তাঁর স্ত্রী সুপ্রভা দেবীকে খুব মোলায়েম গলায় বললেন, আপনার মেজ পুত্রটির কি এখন আসার সময় হয়েছে?

মা বুঝতে পারে বাবা তাঁর সন্তান-সন্ততিদের বাড়ি ফিরে না দেখতে পেয়ে খুব রেগে গেছেন। আজকাল যজমান এবং শিষ্যরা মাসান্তে ঠাকুরের নামে ছু-পাঁচ-দশ টাকা মনিঅর্ডার করে থাকে। অন্যান্যবার এসেই প্রথম বাবা সাধারণত বারান্দায় বসে হুঁকো সাজতে না সাজতেই বেশ মধুর স্বরে বলতেন, ও ধনবৌ, টাকা-পয়সা কিছু এল? সাধারণত কিছু এসেই থাকে। ছু টাকা পাঁচ টাকা মাঝে মাঝেই এসে থাকে। তাতে খুব একটা সমারোহে সংসার চলে যায় না—কোনো রকমে ডালভাতের সংস্থান হতে পারে—এই ডালভাতের সংস্থান করতে পারাটা একটা উদ্বাস্তু পরিবারের পক্ষে কত কৃতিত্বের

ব্যাপার সেটা বাবার হুঁকো খাওয়ার সময় মুখ না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। এবারে তিনি হুঁকোটি পর্যন্ত ছুঁলেন না। মা নিজেই হুঁকো সেজে বাবার সামনে এনে দিয়ে বলল, কোথাও গেছে। আসবে। বাবার মাথা ঠাণ্ডা করার এর চেয়ে মোক্ষম দাওয়াই আর কিছুই নেই। এতদূর থেকে এসে স্ত্রীর এমন আপ্যায়নে বিগলিত হয়ে গেলেন। বললেন, গেছে কোথায়?

—কোথায় যাবে আবার। পিলু বোধহয় ব্যারেকে গেছে। মায়া বিলুকে বলেছি, তোর বাবা ফিরবে, দেখ না ছুটো গিমা শাক পাস কি না। এখন বর্ষা পড়েছে, কোথাও গজাতে পারে। তুমি তো গিমা শাক খেতে খুব ভালবাস। গাছে ছুটো বেগুন হয়েছে। বেগুন দিয়ে রাতে গিমা শাক করব ভেবেছি।

এ-সবই হয়ে থাকে সংসারে এখন। সামান্য চাল ডাল নুন তেল থাকলে আর কোনো উচ্চাশার কথা ভাবা হয় না। বাবা জবা ফুলগাছটা লাগাবার ঠিক আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম। আমি আর মায়া। আমাদের কোঁচড় ভর্তি গিমা শাক। বাবা দেখে তো বেজায় খুশী। বললেন, জবা ফুলের ডাল ছুটো কোথায় লাগাবি? যেন আমি যেখানে পছন্দ করব সেখানেই লাগানো হবে। বাবা তাঁর নতুন আবাসটির কোথাও আর কোনো ত্রুটি রাখতে চাইছেন না। এই সুমার বন-বাদাড়ে পূজার ফুলের খুবই অভাব। বিশেষ করে শ্বেত জবা রক্ত জবা এই ছুটো ফুল পূজার অপরিহার্য অঙ্গ। পূজায় বসে বাবা সে-সব ফুল পাবেন কোথায়? বাগদি পাড়ার কাছে একটা করবী ফুলের গাছ শেষ পর্যন্ত কিছুটা বাবাকে স্বস্তি দিয়েছে। পুলিস ব্যারাকে ফুলের গাছ বলতে ম্যাগনলিয়া, গোলাপ, বোগেনভেলিয়া। এমন সব ফুল যা একটাও পূজায় লাগে না। সেজন্য বাবা রোজ সকালে স্নান করার সময় ল্যাংড়ি বিবির হাতা থেকে ছুটো-একটা পদ্ম তুলে আনেন। ভবিষ্যতে যাতে পূজায় ফুলের অভাব না হয়, স্থলপদ্ম গাছ, শিউলি ফুলের গাছ এবং কিছু

দোপাটি ফুলের চারা ইতিমধ্যেই লাগিয়ে গেছেন। আর বাবা বাড়ি না থাকলে পূজার ভার আমার ওপর। পঞ্চদেবতার পূজা, গণেশের পূজা, লক্ষ্মীর ধ্যান, এই সব মন্ত্র একটা খাতায় লেখা থাকে। আমি দেখে দেখে মন্ত্র আওড়াই আর 'এষ দীপায় নম, এষ ধূপায় নম' করি। তখনই সংসারে পিলু সব চেয়ে বেশি খাপ্পা হয়ে যায় আমার ওপর। যেহেতু আমাদের খুব শৈশবে পৈতা হয়েছে—পিলুর ধারণা পূজা করার এক্তিয়ার তারও আছে। কিন্তু বাবা বাড়ি থেকে যাবার আগে পূজার ভার যেমন আমার ওপর অর্পণ করেন, তেমন বাড়িঘর দেখাশোনার ভার পিলুর ওপর অর্পণ করে যান। এতে পিলু বাবার ওপর খুব রুষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু মুশকিল পিলু সকাল হলেই পেট ভরে খেতে চাইবে। পুজো করার কথা থাকলে সে না খেয়ে পুজোয় বসবে না, আসলে অত বেলা পর্যন্ত আজকাল আর না খেয়ে একেবারেই সে থাকতে পারে না। আর ওর ঈশ্বরে বিশ্বাসও খুব একটা প্রবল নয়। যদিও ঈশ্বরের প্রতি ভূতের ভয়ের মতো একটা ভয় তার সব সময়ই আছে।

বাবা বললেন, আমার মেজ পুত্রটি না এলে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। এবং এক সময় মেজ পুত্রটি এক বোঝা কাঠ মাথা থেকে নামিয়েই বাবার কাছে ছুটে এল। পিলু কাছে এলে হুঁকোটি ওর হাতে দিয়ে বললেন এখন অনেক কাজ। পিলু হুঁকোটি যথাস্থানে রেখে এলে বাবা বললেন, দুটো জবা ফুলের ডাল এনেছি। একটা শ্বেত জবা, একটা রক্ত জবার। কোথায় লাগাবি?

পিলু এত বড় গুরুদায়িত্বের কথা ভেবে প্রথমে সামান্য হকচকিয়ে গেল। বাবা গাছটাছ তাঁর মর্জিমতোই লাগান। তারপর দ্বিতীয়বার আবার সেই গাছটাছ পিলুর মর্জিমতো লাগানো হয়। কোনোটা বাঁচে কোনোটা মরে। কিন্তু জবা ফুলের ডাল দুটিকে দু'বার দুজন দুজনের মর্জিমতো লাগালে ধকল সইতে পারবে না। এবং এমন মহার্ঘ ডাল দুটোকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য

বাবা বাধ্য হয়ে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের শরণাপন্ন হলেন।

বাবার দ্বিতীয় অথবা মেজ পুত্রটি পেছনে দু'হাত রেখে প্রথমে ঠাকুরঘরের চারপাশটা ঘুরে দেখল। যেসব গাছটাছ আছে, যেমন একটা স্থলপদ্মের গাছ, পাশে দুটো গোলাপের গাছ, টগর এবং জুঁই ফুলের গাছ, তার পাশে সুন্দর মতো একটা করবীর চারা বেশ সতেজ ডাল মেলে দিয়েছে, পিলুর জায়গাটি কেন জানি লাল জবাডালটির জন্য পছন্দ হয়ে গেল। সে উঠোনে গিয়ে বলল, বাবা, দাও লাগাচ্ছি।

বাবা ওই লাগাক, ওর মর্জিমতো কাজটা হলেই শেষ পর্যন্ত গাছটা বাঁচবে ভেবে বললেন, কোথায় লাগাবি ঠিক করেছিস ?

—করবী গাছটার পাশে।

মেজ পুত্রটি এমনিতে তাঁর বেশ বুদ্ধিমান। কিন্তু জায়গা নির্বাচনে কাজটি যে ঠিক হয়নি এবং সোজাসুজি ঠিক হয়নি বললেও মেজ পুত্রটির শেষমেষ যদি নিজের জেদ বজায় রাখার নিমিত্ত আবার দু'বারের ঠেলা সামলাতে হয় গাছটাকে তবেই গেছে। তিনি ডালটি এবং একটা খুরপি নিয়ে ওর সঙ্গে এলেন। বললেন, সত্যি জায়গাটা খুব ভাল। গরু-ছাগলে খেতে পারবে না। কিন্তু করবী গাছটা খুব বড় হয়ে গেলে তোর জবার ডালটা আলো-বাতাস একেবারেই পাবে না।

এমন একটা সাধারণ সত্য-জ্ঞানের অভাব ভেবে পিলু কেমন বাবার ওপরই কাজের ভারটা ছেড়ে দিল। তারপর আমাকে, মাকে ডাকল। আমরা প্রায় বাড়ির সবাই, এমন কি কুকুরটা পর্যন্ত যতক্ষণ ডাল দুটো লাগানো না হল দাঁড়িয়ে থাকলাম। এবং বাবা এবারে যেন নিশ্চিন্ত মনে বললেন, যাক ধনবৌ, তোমার লাল জবা, শ্বেত জবাও হয়ে গেল।

আসলে বাবা আমার তাঁর সেই দেশ বাড়ির কথা বুঝি এতদিনেও এক বিন্দু ভুলতে পারেননি। বাড়িটার জন্য বাবা কী যে না

করছেন। ফলের গাছের একটা লিস্টিও বাবা এক রাতে বসে কুপির আলোতে বানিয়ে ফেললেন। মানুষের ঘরবাড়ি করতে যা যা লাগে তার কোনো ত্রুটি থাকুক বাবা সেটা একদম পছন্দ করতেন না।

মা একদিন বাবার এত উৎসাহের মধ্যে বলে ফেলল, সবই হচ্ছে, খুঁজে-পেতে সব শিষ্য যজমানদের ঠিকানা নিয়েছ, সব খেরো খাতায় লিখে রেখেছ, ছেলে ক'টাও বড় হচ্ছে। শুধু তোমার ঘর-বাড়ি বানালেই চলবে, বিলু পরীক্ষাটা দেবে না? পিলুকে শহরের স্কুলে দেবে না? মায়া বাড়িতেই পড়তে পারে। ছোটটার না হয় বয়স হয়নি…।

বাবা নিশ্চিন্ত মনে বললেন, ও হয়ে যাবে। মানুষের বাড়িঘর হয়ে গেলে সব হয়ে যায়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাক্স থেকে বইগুলো বার কর। বসে থাকলে তো পেট ভরবে না।

বাবা তাঁর পছন্দমতো কাজ না হলে নির্বিঘ্নে সব ভুলে যেতে ভালবাসেন। তিনি বই বাক্স থেকে কবেই বের করে দিয়েছেন। যখন দু-চার দিনের মতো খাবার মজুত ঘরে থাকত, তখনই আমাদের পড়ার কথাটা বাবার মনে পড়ত। প্রায় সকালে উঠে বাবা হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিতেন। নিজেই মাদুর পেতে বলতেন, পড়তে বোস। বইটই নিয়ে এস, দেখি কে কতটা এগোলে। মাসাধিককাল পর পর তিন-চার দিনের বাবার এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা খুবই ওয়াকিবহাল ছিলাম। আমরাও তখন উচ্চস্বরে পড়তাম। সবচেয়ে উচ্চস্বরে পড়ত তাঁর মেজ পুত্রটি। সে রাজ্যবর্ধনের বোন রাজশ্রীর সেই আগুনে ঝাঁপ দেবার মুখের দৃশ্যটি খুব মনোযোগসহকারে পড়ত। গ্রহবর্মার মালবরাজ দেবগুপ্ত আর বাংলার রাজা শশাঙ্কের মিলিত সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজয়ের পাতাগুলিও সে পড়ত গলা ফাটিয়ে। আর মাঝে মাঝে নিজের বোন মায়া দেবীকে কিল চড় ঘুষি বাবার অলক্ষ্যে যখন যেটা

সুবিধা ব্যবহার করে চলত।

আমাদের এই তিনজন পড়ুয়ার মধ্যে মধ্যমণি হয়ে বসে থাকতেন বাবা। বাবার কোলে যিনি থাকতেন, তার প্রতাপ সবার চেয়ে বেশি। সে খুশিমতো যার তার বই টেনে নিত, চিবুত, কখনও কোনো বই-এর পাতা ছিঁড়ে ফেলত। তার সব অধিকার ছিল। বাবা মাঝে মাঝে তার ছোট পুত্রটির কাণ্ডকারখানায় বিব্রত হয়ে বলতেন, আহা কী করলি! দিলি তো ছিঁড়ে। ধমক দিলেই ছোট ভাইটির ভারী বদ অভ্যাস ছিল। নির্ঘাত সে বাবার কোলে পেচ্ছাব করে দেবে। বাবাও সেই ভয়ে খুব জোরে কিছু বলতে সাহস পেতেন না। কোল থেকে তুলেও দিতেন না। কারণ মা'র তো সকাল থেকে কাজের অন্ত থাকে না। মাকে গিয়ে জ্বালাতন করবে ভয়েই বাবা সব উপদ্রব সরল মানুষের মতো সহ্য করে যেতেন। ছোট সন্তানকে তাঁর শাসন করার কোনো অধিকারই মা বাবাকে দেয়নি। এছাড়া এ-সব ব্যাপারে বাবার ভীষণ আপেক্ষিক তত্ত্বে বিশ্বাস ছিল।

আমি প্রথমে কিছু ইংরেজি কবিতা পড়লাম। কবিতাগুলি ক'দিন পড়লে বেশ মুখস্থ হয়ে যায়, না পড়লে আবার সহজেই ভুলেও যাওয়া যায়। বাবার সামনে কখনই বাংলা সংস্কৃত পড়ি না। কারণ বাংলা এবং সংস্কৃত পড়লেই তাঁর অধীত বিদ্যার মধ্যে পড়ে যায়। তিনি তখন এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করতে থাকেন যে, আমার আসল পড়াটাই আর হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ বাবা আমার সংস্কৃতে এবং বাংলাভাষায়, এমন কী ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের বহর বোঝাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সকালটা কীভাবে যে নষ্ট করে দেন! তাঁর মেজ পুত্রটি বাবার এই দুর্বলতা বিলক্ষণ টের পায় বলেই প্রথমে ইতিহাস ধরেছে। বাবা একটা কথাও বলেননি। তারপর বাংলা—বাবা তেমনি চোখ বুজে শুনে যাচ্ছেন। উচ্চারণে ত্রুটি ঘটলে কেবল সেটা ধরিয়ে

দিচ্ছেন। বাবা কিছুদিন আগে তাঁর জ্ঞানের বহর বোঝাতে গিয়ে যে শেষ পর্যন্ত একবিন্দু আমাদের কারো পড়া হয়নি, মা সেটা ধরিয়ে দিতেই মৌনীবাবা সেজে এখন ছেলে কোলে নিয়ে প্রায় মহাদেবের মতো বসে আছেন।

আর সেই বাবা সহসা বলে উঠলেন, ওরে বিলু অঙ্ক করছিস না কেন ?

বললাম বইটার হাফ নেই বাবা।

—জ্যামিতি ?

—ওটা আনতে হবে।

বাবা তারপর মোটামুটি হিসাব নিয়ে বুঝতে পারলেন, আমার বই-এর সংখ্যা যথার্থই কম। এবং বাবা যেন এটা আজই জানলেন, তেমনভাবে বললেন, তবে শহরে চল, মানুকে বলে-কয়ে কিছু পুরনো বইটই পাওয়া যায় কিনা দেখি। কি কি নেই একটা লিস্টি করে ফেল।

এই লিস্টি আজ নিয়ে মোট পাঁচবার করা হল। কে. পি. বসুর অ্যালজাব্রা আছে। তবে সবটা নেই। জ্যামিতির হাফ আছে। কারণ দু' বছরের টানা-হ্যাঁচড়া। এবং আমার আর কখনও পড়াশোনা হবে ভাবিনি। যতই বাবা বলুন, বাড়িঘর হয়ে যাক তখন দেখা যাবে। কখনও প্ল্যাটফরমে, কখনও পোড়ো বাড়িতে থাকতে থাকতে ভাবতেই পারিনি, এ দেশে এসে কখনও আমাদের শেষ পর্যন্ত বাড়িঘর হবে। সুতরাং বেশ নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু বাড়িঘর হয়ে যাওয়ার পর পরীক্ষাটা না দিলে যেমন বাবার সম্মান থাকে না, তেমনি এই বাড়িঘর বানানোরও কোনো অর্থ হয় না।

বিকেলেই বাবা শহরে মানুকাকার কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, কাকাকে বলো তোমার কী কী বই নেই। যখন পুরো লিস্টি দিলাম, তখন সেই কাকাটি হতবাক্। বললেন, কি করে পরীক্ষা দিবি ? চার মাসও তো বাকি নেই। কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাস্টারমশাই

কাকার বন্ধু লোক। কাকা আবার আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি একটি চিরকুট লিখে তাঁর এক শিক্ষকের কাছে পাঠালেন। তিনি তাঁর দুই ছাত্রের ঠিকানা দিলেন। ওদের বাড়তি বই-টই যদি থাকে। ওরা পাঠালো খেলোয়াড় বিনয় দাসের কাছে। সে এবারে পরীক্ষা দিচ্ছে না। তার বইগুলি যদি পাওয়া যায়। কিছু পাওয়া গেল, কিছু পাওয়া গেল না। বইগুলি যে নেই বলল না। বললে, বিনয় দাসের বাবা মুদিখানার মালিক তাকে আর আস্ত রাখত না। যাই হোক এই করে যখন কিছু বই নিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম, মা আমার খুবই আশ্বস্ত হলেন। মা, যে মা, যে কখনও জানেই না, কোন্ বই-এর কি নাম লণ্ঠন জ্বেলে উবু হয়ে বসল। সব বই দেখে বলল, এর তো দেখি ভেতরে সব পাতা কাটা রে। কেমন সুন্দর করে কেটেছে দেখ!

বাবা বললেন, সত্যি তো!

আমি বললাম, বাবা বিনয় দাস চারবার চেষ্টা করে পারেনি। বোধহয় সেজন্য মা সরস্বতী রাগ করে সব ভাল ভাল জায়গাগুলি বই থেকে চুরি করে নিয়েছেন।

বাবা বললেন, তবু তো বই। এই বা কে দেয়। মন দিয়ে পড়লে ওতেই পাস করে যাবে।

বাবা বলতে কথা। বাবার কথা ফেলা যায় না। তখন সেই বই সম্বল করেই আমার পড়াশোনা আরম্ভ হয়ে গেল। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী আমি। বাবা এক ফাঁকে নিবারণ দাসের আড়তেও চলে গেলেন। বলে এলেন, দাসমশাই, বড় ছেলে আমার এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে। শুধু নিবারণ দাস কেন, যার সঙ্গেই দেখা হত একথা সেকথার ফাঁকে বাবা বলতেন, বিলুটা এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে। বাবার বাড়িঘরের সঙ্গে তাঁর বড় ছেলের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়াটা বড়ই গৌরবের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত। ম্যাট্রিক পরীক্ষার চেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষাটা আরও যেন গম্ভীর শোনায়।

বাবা সব সময় খুব জরুরী কথাবার্তায় খুব সাধুভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। এবং এভাবেই এই বাড়িতে শীতকালও এসে গেল। এখন পিলু পর্যন্ত আমাকে সমীহ করতে শুরু করেছে। আমার পড়ার জন্য বাবা শেষ পর্যন্ত একটা হ্যারিকেনও কিনে ফেললেন।

আর আমি জানি, বাবা যেখানেই এখন যাচ্ছেন বিয়ের কাজে অথবা কোনো পুজো-আর্চার ব্যাপারে ঠিক কথায় কথায় তাঁর বড় ছেলে কত লায়েক, কী পরীক্ষা দিচ্ছে সে-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা না করে ছাড়ছেন না। বাড়ি ফিরলেই বাবা বলতেন, জগদীশ বলল, প্রবেশিকাটা পাস করলেই কর্তা আপনার আর কোনো ভাবনা নেই। অফিসে চাকরি হয়ে যাবে। বাবার ছেলে অফিসবাবু হবে শুনে মা খুব অমায়িক হয়ে যেতেন। মা বলতেন, হাত-মুখ ধুয়ে একটু কিছু খাও। কোন সকালে তো বের হয়েছ।

এই বাড়িঘর, গাছপালা এবং বনভূমির মধ্যে রাতে আমার উচ্চস্বরে পড়া বাবার চোখে-মুখে এক আশ্চর্য প্রশান্তি এনে দিত। তিনি মাঝে মাঝে গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানতেন। আর কখনও সকালে সেই পড়াশোনার মধ্যেই পিলু খবর দিত এই বিরাট বনভূমির কোন দিকটার সব গাছপালা কেটে লোকে নতুন আবাস তৈরি করছে এবং আমার মনে হত পিলুর ভারি কষ্ট হত এতে। এই বনভূমিটা যেন পিলুর সাম্রাজ্য—সবাই কে কোথা থেকে এসে সব গাছপালা কেটে ফেলছে। বনভূমির সেই আদিম আশ্চর্য রহস্যটা সরে যাচ্ছে বলে পিলুকে প্রায়ই খুব ম্রিয়মাণ দেখাত। কুকুরটাকে নিয়ে সে আগে যেমন এই বনভূমির অভ্যন্তরে ঢুকে অদ্ভুত সব খবর নিয়ে আসত আমাদের জন্য এখন আর তেমন পারে না। গাছপালা কেটে ফেলায় একটা উষর জমির মতো দেখায় এবং সেখানে মাঝে মাঝে শোনা যায় বাঁশ কাটার শব্দ। বাবার খুব তখন আনন্দ। পূজা শেষ করে বাবা যত জোরে সম্ভব শঙ্খে ফুঁ দিতেন। কাঁসর ঘণ্টা বাজাতেন। পিয়ন আসত ঠাকুরের নামে আসা যজমান অথবা

শিষ্যদের মনিঅর্ডার নিয়ে। কেউ পাঁচ টাকা, কেউ দশ টাকা মাসোহারা দেয়। আর বাবার কিছু যজমান নিবারণ দাসই ঠিক করে দিয়েছে। শহরের মানুকাকাও ভাল পুরোহিতের খোঁজে কেউ এলে বাবাকে খবর পাঠায়। আর যারা বাবার মতো নতুন ঘরবাড়ি করছে, দিনখন দেখতে এলে বলে দেন, ঠাকুরের ফুল-তুলসী নিয়ে যাও। ওতেই হয়ে যাবে। জায়গাটার কথা বললে বলেন, মাটি মাটি। তার তুলনা নেই ভুবনে। যেখানেই আবাস, সেখানেই মানুষের সবকিছু। বাবার এমন সুন্দর কথা ওদের খুব ভাল লাগত। পূজা-পার্বণে দিন দিন যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে এটা বোঝা যাচ্ছিল সবই বাবার স্বভাবগুণে।

এ-ভাবে শীতকাল শেষ হয়ে গেল এই বনভূমিটায়। এখন আর আগের মতো একে আমরা ঠিক বনভূমি বলতে পারি না। কারণ বাদশাহী সড়কের ধারে ধারে সর্বত্রই মানুষের নতুন বাড়িঘর উঠে যাচ্ছে। ভেতরের দিকে, অর্থাৎ যে সুমার বনটা প্রায় মাইলব্যাপী কারবালা পর্যন্ত চলে গেছে এবং যেখানে কবে কোন আদ্যিকালে একটা ইঁটের ভাঁটাও কেউ করেছিল—কেবল সে জায়গাটা কেন জানি মানুষ এখনও ঠিক পছন্দ করছে না। ফলে ওদিকটার বড় বড় শিরিষ গাছগুলি থেকে পাতা ঝরতে লাগলো ঠিক আগের মতই; কিছু শাল গাছ অথবা পিটুলি গাছের পাতাও ঝরছে। রোদের তাত বাড়ছে। মাঠে অথবা কোনো শস্যক্ষেত্রে আগে যে খরগোস সজারুর উপদ্রব ছিল তাও ক্রমে কমে আসতে লাগল। কিছু বড় বড় গো-সাপ ছিল বনটাতে, ওদেরও আর বিশেষ দেখা পাওয়া যেত না। রাতে শিয়ালের সেই তীব্র চিৎকার ক্রমে দূরবর্তী শব্দের মতো মিহি হয়ে যেতে থাকল। এবং এত সবের মধ্যেই আমায় একদিন শহরে যেতে হল পরীক্ষা দিতে। মা কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দিল। বাবা-মাকে প্রণাম করতে হল। ঠাকুরের ফুল বেলপাতা বাবা পকেটে দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার জন্য বাবার

বিশ্বাসে যা কিছু দরকার সবই করা হল।

পরীক্ষার ক'টা দিন বাড়ি থেকে বাবা কোথাও গেলেন না। পূজার সময় বেড়ে গেল। শালগ্রামের মাথায় বোঝা বোঝা তুলসী পাতা চাপাতে থাকলেন। শহরে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি। বাড়িতে বাবা ঠাকুরের কাছে পরীক্ষা দিচ্ছেন। ধৈর্যের পরীক্ষা বোধহয়। কারণ বাবার জানা যত দেবতা আছেন সবার উদ্দেশেই ফুল চন্দন দিতে দিতে বিকেল হয়ে যেত বাবার। কেউ বাদ গেলে ষড়যন্ত্র করে বাবার সব ভণ্ডুল করে দিতে পারে। শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেখি মা খুব উদ্বিগ্ন চোখে-মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। মায়া ভাইকে কোলে নিয়ে রাস্তার গাছপালা দেখাচ্ছে। পিলু রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল আমি কখন ফিরব! কেবল বাবা নেই। ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ। মাকে বললাম, বাবা কোথায়?

ঠাকুর ঘরে সেই সকালে ঢুকেছে এখনও পুজোই শেষ হচ্ছে না।

বুঝলাম, তাঁর বড় পুত্রের জন্য বাবা আজ তেত্রিশ কোটি দেবতাকেই খুশী করতে ব্যস্ত। তাঁর নিজের এত সখের বাড়িঘরের কথা মনে নেই। প্রিয় কুকুরটার কথা মনে নেই। দেবতাদের তুষ্ট করতে গিয়ে দিনশেষে বেলা যায় তাও তিনি বুঝি ভুলে গেছেন।

ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে এগিয়ে গেলাম। খুব সতর্ক গলায় ডাকলাম,—বাবা।

বাবা রা করলেন না।

আবার ডাকলাম, বাবা, আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

বাবা কেমন ধ্যানমগ্ন গলায় বললেন, শেষ হল বলো না। পরীক্ষা সবে শুরু হল। বাবা কী অর্থে কথাটা বললেন, বুঝতে পেরে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাবা তখন ডাকলেন, হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম কর এবং এ-সবে আমার কঞ্চিৎ বিশ্বাসের অভাব ছিল। তবু বাবার কথা। ঘরে ঢুকে ঠাকুর প্রণাম করলে সামান্য চরণামৃত দিলেন খেতে। এত সবের পর বাবার পুজো শেষ ধরতে পারলাম।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পরীক্ষা ভালমন্দের কথা তিনি আজ পর্যন্ত একবারও জিজ্ঞেস করলেন না। সবই ঠাকুরের কৃপা, ভাল-মন্দ বলে যেন কিছু নেই। শুধু নিজের কাজটুকু করে যাও। বাবার এমন সব কথা আমরা অনেকবার শুনেছি। মা মাঝে মাঝে একই কথা শুনে রেগে যেত। কিন্তু পরীক্ষার কটা দিন বাবার পুজো আর্চায় মা সাংসারিক অনটনের কথা বলে এতটুকু বিব্রত করল না। বাবার সঙ্গে মাও এ-ক'টা দিন খুবই ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম।

ফল বের হবার আগে পর্যন্ত বাবা আমাকে কোথাও গেলে সঙ্গে নিতে শুরু করলেন। শহরে মানুকাকার বাড়ি গেলে বললেন, সব তাঁরই ইচ্ছে। বিলু তো এবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল। তোর তো জানাশোনা আছে অনেক। দেখিস যদি কিছু করতে পারিস। নিবারণ দাসের আড়তে নিয়ে গেলেন একদিন। বললেন, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে বিলু।

এই প্রবেশিকা পরীক্ষা বাবার জীবনে তাঁর বাবার জীবনে কখনও ঘটেনি। অত বড় পরীক্ষা দিয়েছে ছেলে, তাকে দশজনের কাছে নিয়ে যাওয়া বাবার খুবই দরকার। তাঁর বড় ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে, কত বড় কথা!

ফল বের হবার দিন শহরে গেলাম। মানুকাকা বললেন, তুমি এক বিষয়ে ফেল করেছ। স্কুলের মণ্টু মাস্টার খবরটা দিয়ে গেছে। খুব দমে গেলাম। তিনি ফের বললেন, দু' মাস পরে পরীক্ষা হবে। তখন পরীক্ষাটা দিতে পারবে। অঙ্ক পরীক্ষা। দুটো মাস আর সময়। মন দিয়ে পড়াশোনা করলে পাস করে যাবে।

কিছুই ভাল লাগছিল না। বাড়ি ফেরার পথে সাহেবদের একটা নির্জন কবরখানা পড়ে। বড় বড় সব ঝাউগাছ। সেখানে সারাটা দুপুর শুয়ে থাকলাম। কেবল বাবার মুখটা আমার চোখে ভেসে উঠছে। তাঁর কত বিশ্বাস আমার ওপর। এখন মুখ দেখাব কী করে!

কী করি। ফেরার হলে কেমন হয়। তখনই মার সেই বিষণ্ণ মুখ ভেসে উঠল। বাবার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর পুত্র-গৌরব নিমেষে কেউ হরণ করে নিয়ে গেল। তবু কেন জানি পিলু মায়া ছোট ভাইটার কথা ভেবে ফেরার হতে ইচ্ছে হল না। সাঁঝ লাগার আগে গুটি গুটি বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলাম। রাস্তাটা যেন আজ কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। পুলিস ব্যারাক পার হতেই বড় মাঠ। মাঠে পড়েই দেখলাম, সবাই বাড়ির রাস্তায় গাছের নিচে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। পিলু ছুটতে ছুটতে আসছে। মায়া ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল। অন্য দিন হলে ভ্যাক করে কেঁদে দিত। আজ তার কান্নার কথা মনে পড়ল না। কতক্ষণে আমার কাছে পৌঁছবে। ওরা কাছে এলে কীভাবে যে বলব, পরীক্ষায় পাস করতে পারিনি পিলু। পিলু এ-কথায় সবচেয়ে বোধহয় বেশি ভেঙে পড়বে এবং বনভূমিটা থেকে আমরা যে ঘরবাড়ি ছিনিয়ে নিয়েছি, আমার মনে হল খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বনভূমি বাড়িটাকে গ্রাস করে ফেলবে।

পিলু চিৎকার করে বলল, দাদা, পাস্ করেছিস ?

কিছু বললাম না। কারণ বলতে পারছিলাম না কিছু। আমার চোখ ফেটে জল আসছে। বাবা এগিয়ে এসে বললেন, পাস করলি ?

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, কেঁদে ফেললাম।

বাবা বললেন, কান্নার কী আছে ? সবাই বুঝি পাস করে !

বাবার কথায় ভেতরের দুঃখটা সহজেই কত লাঘব হয়ে গেল।

বাবা আবার বললেন, ক' বিষয়ে পাস করেছিস ?

এটাই বোধহয় বাবার শেষ সান্ত্বনা। বললাম, ন' বিষয়ে পাস। অঙ্কে ফেল।

বাবা বিজয় গৌরবে এবার আমার হাত ধরে ফেললেন। বললেন, দশটা বিষয়ের মধ্যে ন'টা বিষয়ে পাস—কম কথা হল ! এটা তো পাসই। ক'টা লোক কবে সব বিষয়ে পাস করেছে ! বড় হলে বুঝতে পারবি।

এবং তারপর থেকে আমার সেই নির্দিষ্ট অঙ্ক পরীক্ষার দিনটি পর্যন্ত যার সঙ্গে দেখা হত বাবা বলতেন, বিলুটা দশটা বিষয়ের মধ্যে নটাতেই পাস করেছে। একদিন নিবারণ দাসের পাটের আড়তেও খবরটা দিতে চলে গেলেন বাবা। বললেন, কম বড় কথা না! কী বলেন দাসমশাই!

দাসমশাই আড়তে বসে হুঁকাটি বাবার হাতে দিয়ে বললেন, সত্যি ভারি গৌরবের কথা। বাবা আনন্দে তখন তন্ময় হয়ে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছেন। পুত্র-গৌরবে হাসিটি তাঁর মুখে লেগেই আছে।

॥ দশ ॥

দেশ ছেড়ে আসার পর, দু-তিন বছর আমাদের কারো কোনো অসুখ হয়নি। এমন কি সামান্য সর্দি কাশিতে কেউ ভুগিনি। মানুষের অসুখ বিসুখ থাকে আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। গাছপালা আর মাটির সঙ্গে লেপ্টে থাকলে তাই বুঝি হয়। শীতের চাদর থাকত না, খালি গায়ে দিন দুপুরে ঘুরে বেড়ানো, গাছ পাতা বনআলু খেয়ে আমাদের আশ্চর্যভাবে জীবনীশক্তি বেড়ে গিয়েছিল। ঠাকুর প্রতিষ্ঠার পর আমাদের এখন প্রায় সুদিনই বলা চলে। শীতের চাদর পর্যন্ত বাবা কিনে দিয়েছেন। আর তখন থেকেই আমরা কেউ কেউ সর্দি কাশির শিকার হতে থাকলাম। সর্দি কাশিতে বাবা গা করতেন না। হয়েছে সেরে যাবে। মানুষের ঘরবাড়ি হবে অসুখ বিসুখ হবে না সে আবার কেমনতর কথা!

আমার মা, বাবার হাভবাব কিছুদিন শুধু লক্ষ্য করেই গেল পিলুর সর্দি-কাসি, মায়ার আমাশয়, আমার ক'দিন জ্বর, মাও কিছুদিন অম্বলের রোগে ভুগে উঠল। সবই বিনা ওষুধে ছেড়ে যাওয়ায় বাবা বললেন, নিজের মধ্যেই আছে, সঞ্জীবনী সুধা। তাকে

ধনবৌ বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু বর্ষা পড়তেই একদিন পিলু খুব জলে ভিজে বাড়ি ফিরে এল। পুকুর ডোবা খাল বিল জলে ভেসে গেছে। পিলু ব্যারেকের পুকুরে উজানী মাছের খোঁজে গিয়েছিল। কটা কৈ, মাগুর, সিংগি মাছ সে জলে ভিজে ধরেছে। আকাশটাতে ছিল প্রচণ্ড কালো মেঘ। আর ঝড়ো বাতাস। গাছপালা জলে ভিজে চুপসে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে পিলু বৃষ্টি মাথায় করে মাছ নিয়ে যখন ফিরল, তখন মা ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছে। বাবা বাড়ি নেই। ঠাকুরের বৈকালির কাজ আমাকেই সারতে হবে। সে সময় পিলু গামছা খুলে বলল, দাদা দেখবি আয়। বারান্দায় বের হয়ে দেখলাম, সত্যি কত বড় সব সিঙ্গি, কৈ, মাগুর। সে বলল, কী মাছরে দাদা! আবার যাবি? এমন ঝড় বৃষ্টিতে আমার যেতে সাহস হল না। আর মাও দেখলাম বেশ চুপচাপ। পিলু আবার বলল, মাঠে মাছ উঠে আসছে। কত মাছ ফসকে গেল।

মা কুপি জ্বেলে মাছ দেখতেই সহসা চিৎকার করে উঠল, ওরে পিলু, তোর প্যাণ্টে এত রক্ত কেন রে!

পিলু হাসতে হাসতে বলল, সিঙ্গি মাছের কাণ্ড মা। হাত ফুঁড়ে দিয়েছে।

কিন্তু পিলুর মুখ দেখে আমার ভাল লাগল না। কেমন সাদাটে আর নীল দেখাচ্ছে মুখটা। মা তাড়াতাড়ি কিছুটা হলুদ গরম করে আনতে গেল। পিলু এত সবের মধ্যেও মাছগুলি নিয়ে রাখল হাঁড়িতে। প্যাণ্ট ছেড়ে একটা খোট পরে নিল। বলল, খুব শীত করছে রে দাদা। বলে সে মার একটা শাড়ি দু ভাঁজ করে গায়ে দিয়ে কেমন ঝিম মেরে বসে থাকল।

মায়া তখন কাছে গিয়ে বলল, এই ছোড়দা ঝিমুচ্ছিস কেন?

—খুব শীত করছে।

—শীতে কেউ ঝিমোয়?

—মেলা কথা বলবি না। যা তো!

ঝিমুনোর কথায় আমারও খুব একটা ভাল লাগছিল না। বললাম, সত্যি সিঙ্গি মাছে ফুঁড়েছে না অন্য কিছু!

—অন্য কিছু আবার হতে যাবে কেন!

—তুই দেখেছিস?

—জলে দেখা যায়! ঘাসের মধ্যে অন্ধকারে হাত দিতেই ফুঁড়ে দিল। লম্বা। ধরতে পারলাম না। কত বড় যে না! বলেই ওর চোখ বুজে আসছিল।

আমার কেমন ভয় ধরে গেল। মাকে তাড়াতাড়ি ডেকে বললাম, পিলু কেমন করছে!

মা দৌড়ে এল। বলল, কি হয়েছে?

—পিলু ঝিমোচ্ছে।

মা তাড়াতাড়ি গরম হলুদ আঙুলে লাগিয়ে বলল, ব্যথা করছে?

—না।

—জ্বালা করছে?

—না।

—তোমায় কিছুই করছে না। তবে ঝিমোচ্ছ কেন?

—ঘুম পাচ্ছে।

—পোকামাকড়ে কাটেনি তো?

পিলু বলল, না।

আমি বললাম, যখন ফুঁড়ে দিল, তখন ব্যথা করছিল?

—টের পাইনি। – কত মাছ! মাছ ধরব, না, ব্যথা টের পাব!

মা কেমন হাউমাউ করে কাঁদতে বসে গেল। পিলু ঝিম পায় কেনরে! সিঙ্গি মাছে ফুঁড়ে দিলে ব্যথা করবে। তুই কী ধরতে কী যে হাত দিয়েছিস রে!

মহা জ্বালা দেখছি। মা কাঁদতে কাঁদতে ওর হাতের কব্জিতে মশারির দড়ি বাঁধতে গেলে, পিলু মহারোষে উঠে দাঁড়াল। বলল, বলছি তো পোকামাকড়ে কামড়ায়নি।

এবং আমার সামনে তখন একটা মহাভুজঙ্গ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—দেখতে পাচ্ছি, পিলুর সর্বনাশ হয়ে গেছে। সংসারে মহা সর্বনাশ। বাবা কাল ফিরে এসে কি দেখতে পাবেন বুঝতে পারছি না। কিছু ভেবেচিন্তে ঠিক করতে পারছি না। আর মার এই হাউমাউ কান্না বনটার মধ্যে কেউ শুনতে পাবে না—মানুষের এটা কত বড় বিপদ এই প্রথম টের পেয়ে এক দৌড়ে নিবারণ দাসের বাড়ি যাব ভাবতেই মা বলল, বিলু অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছিস! শুধু সেই অন্ধকার এবং ঝড় বৃষ্টি থেকে চিৎকার করে বললাম, নিবারণ দাসের বাড়িতে যাচ্ছি মা। জ্যাঠাকে খবরটা আগে দিই।

পাল্লা দিয়ে ঝড়ো বাতাস আর বৃষ্টি। শাঁ শাঁ শব্দ। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পথের এখন যেখানে পা দিচ্ছি, মনে হচ্ছে কেবল সাপ। যেন হাঁটলেই পাটা সাপের মাথায় পড়বে। আর এ-সময়ে মনে পড়ল বাবার সেই মহাবাণী, উচ্চারণ করলাম, দোহাই আস্তিকমুনি। আমরা এই বনভূমি সাফ করার সময় কত বড় বড় গোখরো সাপ দেখেছি। বাবা একটাও মারতে দেন-নি। দেখলেই তিনি বলতেন, দোহাই আস্তিকমুনি। সাপেরা তখন মাথা নিচু করে ঝোপে জঙ্গলে ঢুকে যেত। এবং এসবে আমার এবং মার তাছাড়া পিলুর কোনই বিশ্বাস ছিল না। কেবল মনে হত বাবাকে ভালমানুষ পেয়ে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে সাপগুলো। অথচ এখন ঝড় বৃষ্টিতে অন্ধকারে হাতের কাছে এমন মহাসম্বল পেয়ে আরও বেগবান হয়ে গেলাম। মানুষের কি যে থাকে! আকাশ ফালা ফালা করে দিচ্ছে তখন বিদ্যুতের শেকড়বাকড়।

একবিন্দু আর ভয় নেই। যেন সেই আস্তিকমুনির দোহাই শুনে সব আস্তিকেরা আমাকে দেখলেই পালাচ্ছে। এবং মহাভারতের পুণ্যশ্লোকের মতো আকাশ ধরণী নিমেষে বড় পবিত্র হয়ে গেল।

বুঝলাম বাবার সব বিশ্বাসই বড় পবিত্র ইচ্ছের দ্বারা চালিত। বুঝতে পারলাম মানুষের ঘরবাড়ির সঙ্গে এমন সহায় সম্বল না থাকলে সে খুবই অসহায়। এবং কখন নিবারণ দাসের বাড়ি পৌঁছে গেছি খেয়ালই করিনি। এত বড় একটা দুর্যোগের মধ্যে এতটুকু ক্লেশ নেই শরীরে। রাস্তায় দু-পাশে আকাশে বাতাসে কি ছিল টের পাইনি। সামনে নিবারণ দাসের বাড়ি আর মুখে দোহাই আস্তিকমুনি, এতক্ষণ এই ছিল আমার অস্তিত্ব।

দাসের মা বলল, আড়ত থেকে তো ফেরেনি। এই ঝড় বাদলায় ভিজে! কি খবর কর্তা!

কেবল কোনরকমে বললাম, পিলুকে কিসে কেটেছে।

নিবারণ দাসের মা হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর ছোট মেয়ে বলল, ঠাকুর ছাতা নিয়ে যান।

আমি আর কিছুই শুনতে পাইনি। কারণ শরীর তখনও ভারি বেগবান। একটা পাগলা ঘোড়ার মতো দৌড়চ্ছি। দু-বার আছড়ে পড়েছি। সারা শরীর কাদায় লেপে গেছিল, আবার যেতে যেতে কখন তা বৃষ্টিতে ধুয়েও গেছে। পেছনে একবার তাকাতেই মনে হল, বাড়িটা বৃষ্টির ঝাপটায় কুয়াশার মতো একটা পৃথিবী হয়ে আছে। নিবারণ দাসের আড়ত সামনে। জল বৃষ্টির জন্য পাল্লা ভেজানো। ফাঁক দিয়ে হ্যাজাকের আলো এসে পড়ছে। সামনে দুটো গরুর গাড়ি। গাড়িগুলোর ওপর দিয়ে লাফ মেরে নেমে গেলাম। একটা গরুর পিঠে পা পড়ল, এবং পাল্লা ফাঁক করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, জ্যাঠা বাবা বাড়ি নেই, পিলুকে কিসে কেটেছে। মা কাঁদছে।

নিবারণ দাস বলল, কী বলছেন, কিসে কাটবে!

—মাছ ধরতে গেছিল। শীতে শরীর কাঁপছে পিলুর। আর ঝিমুনি। কিছুতে যদি কেটে থাকে, কি করব!

নিবারণ দাস সাহস দেবার জন্য বলল, কিচ্ছু হয়নি। দাঁড়ান।

সব তো ভিজে গেছে! ছাতা আনেননি কেন? এই গোপাল, টাকাগুলো তুলে রাখ। চাবিটা দে। শিগগির কর।

গরীব মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাস ছাড়া কিছু সম্বল থাকে না। বাবারও তাই সম্বল। অথচ আমরা, বিশেষ করে মা এবং পিলুর ঈশ্বর বিশ্বাসে ঘাটতি ছিল খুব। সারাটা রাস্তা ভারি দুর্গম। ঝড় জলে সাপখোপের উপদ্রব বাড়ে। এতটা পথ একা অন্ধকারে ঝড় জলের মধ্যে কী করে এলাম! নিবারণ দাসের কথায় যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি। শীত করছে। জানি একা এতটা পথ আর অন্ধকারে যেতে পারব না। ভূতের ভয় এবং সাপখোপের ভয়। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। নিবারণ দাসের জন্য অপেক্ষা করব না আবার যেমন এসেছিলাম তেমনি ঝড় জলে বের হয়ে পড়ব। বাবা বাড়ি নেই। মা একা। বনভূমির মধ্যে মার অসহায় চোখ মুখ একদণ্ড স্থির থাকতে দিচ্ছে না। সম্বল বলতে আমার গলায় পৈতা আছে আর সাপখোপের জন্য আছেন, আস্তিকমুনি। এবং এই সম্বল করে আবার বের হয়ে ছুটব ভাবছি, খবরটা যখন দিয়েছি, নিবারণ দাস ঠিক যাবে, ওর দেরি হতে পারে, আমার দেরি হলে মা আরও ভেঙে পড়বে। বললাম, জ্যাঠা আপনি আসুন। আমি যাচ্ছি।

নিবারণ দাস রে রে করে উঠল।—আরে না না। আমি যাচ্ছি সঙ্গে। গোপাল, বাবা তাড়াতাড়ি কর।

তাড়াতাড়ি বললেই তো আর হয় না। পাটের আড়ত। কত কাজ গোপালের। দুজন দেহাতী লোক পাটের গাঁট সব তুলে ভিতরে নিয়ে রাখছে। সব রাখতে দেরি হবারই কথা। তারপর দরজা বন্ধ করা, গোটা দশেক তালা ঝোলানো, এতসব কাজের জন্য দেরি হতেই পারে। আমার কাছে একদণ্ড কত অমূল্য সময় এই প্রথম টের পেলাম।

রাস্তায় নিবারণ দাস ছাতা মাথায় বড় ঠুকে ঠুকে হাঁটছিল। টর্চ মেরে গোপাল আগে আগে যাচ্ছে। আমি আরও আগে। নিঝুম

অন্ধকার, গাছপালার সাঁই সাঁই শব্দ আর কড়াৎ করে বাজ পড়ার মাঝে মাঝে বিকট আওয়াজ সব কিছুই কত সহজে এক নিমেষে তুচ্ছ করতে শিখে গেলাম। কেবল আশংকা ভেতরে, পিলু এখন না জানি কেমন আছে। পিলু তোর এত মাছ ধরার বাই কেনরে! পিলুর ওপর অভিমানে চোখ ফেটে জল আসছিল—কিছু যদি ওর হয়ে যায় দেখ তোমাকে আমি কি করি! তারপরই মনে হল বাবার যখন ভগবান আছে, তখন খুব একটা কিছু হবে না। শুধু দুর্ভোগ কিছুটা ওর। মনে মনে বললাম, ঠাকুর পিলুকে ভাল করে দাও। ও খুব দুষ্ট ছেলে। ওকে কষ্ট দিও না ঠাকুর। ও সংসারে না থাকলে আমাদের কিছুই থাকবে না। এবং যতভাবে দরকার ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে কখন যে বাড়ির রাস্তায় হাজির টেরই পাইনি। দু-লাফে একেবারে উঠোন ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললাম, জ্যাঠা আসছে। পিলু, এই পিলু। কোন সাড়া দিচ্ছে না।—এই পিলু জ্যাঠা আসছে রে। আর কোন ভয় নেই।

পিলু খুব ক্ষীণ গলায় বলল, দাদা তুই খুব ভীতু। আমার কিছু হয়নি রে!

পিলুকে তো জানি। সে দশটা কথা বললে পাঁচটা মিছে কথা বলে। এখন দাদাকে ঘাবড়ে যেতে দেখেও মিছে কথা বলছে।

নিবারণ দাস ঘরে ঢুকতেই মা উঠে দাঁড়াল। মা একটা কথা বলছে না। এতক্ষণ পিলুকে জাগিয়ে রাখার জন্য জোরজার করে বসিয়ে রেখেছে। ঘুমিয়ে পড়লেই সব শেষ! দাস লাঠিটা বেড়ার পাশে রেখে পিলুর কপালে হাত দিল। বলল, ও কি তাত? খুব জ্বর হয়েছে দেখছি! জলে কাদায় ঘুরে বেড়ালে তো জ্বর হবেই কর্তা-মা। ওকে শুইয়ে দিন।

মা ঘোমটা সামান্য আরও টেনে বলল, কিসে কেটেছে। ও দেখেনি। হাত বেঁধে দিয়েছি।

নিবারণ দাস হা হা করে হেসে দিল। বলল, কর্তামা পোকামাকড়ে

কাটলে শরীরে তাপ ওঠে না। কৈ দেখি হাতটা মেজ ঠাকুর? বলে টর্চ জ্বেলে আঙুলের কড়া দেখল। টিপে টিপে বলল, বেশ জাঁদরেল মাছ ছিল দেখছি! ধরতে পারলেন না!

পিলু কেমন সাহস পেয়ে গেছে। সে বলল, খুব বড় ছিল। এই বড় জ্যাঠা। মাছটা না……।

নিবারণ দাস দড়ির গিঁটগুলি খুলে দিতে দিতে বলল, ও কি বেঁধেছেন! হাতে দাগ বসে গেছে। এতক্ষণ বোধহয় হাতটা পিলুর ভীষণ টনটন করছিল, বাঁধন খুলে দিতেই পিলু যেন প্রাণ পেয়ে গেল। বলল, জ্যাঠাকে দেখা না দাদা, কত বড় বড় সিঙ্গি মাগুর ধরেছি। যেন ওর কিছুই হয়নি। মারও মনে জোর এসে গেছে। মা তাড়াতাড়ি মাছগুলি টেনে নিয়ে এনে দেখাল, দেখুন কী কাণ্ড, কত বড় মাছ।

নিবারণ দাস বলল, মেজ ঠাকুর আপনার কিছু হয়নি। জলে কাদায় ভিজে জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে। এত বড় মাছ ধরেছেন একটু জ্বর জালা হবে না সে কি করে হয়।

এই বলে নিবারণ দাস গোপালের সঙ্গে বের হয়ে গেল। মা বসতে বলল একটু। আমাকে তামাক সেজে দিতে বলল, নিবারণ দাস জানাল, বাবা এলে বসবেন। তামাক খাবেন। কেমন থাকে পিলু, সকালে একটা খবর দিতেও বলে গেল। মানুষের ঘরবাড়ির সঙ্গে একজন ভাল প্রতিবেশী কত দরকার এই প্রথম আমরা টের পেলাম। নিমেষে সব ভয় আতঙ্ক কত সহজে দূর হয়ে গেল। আমার মা দেখলাম আবার বীরাঙ্গনার মতো চলাফেরা করছে। বলছে, বিলু, ঠাকুর শোওয়ানো হয়নি। যা বাবা বৈকালিটা দিয়ে আয়।—পিলু তুমি আর বসে থেক না। মায়া কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ও বাড়িঘরে এমন একটা আতঙ্ক এসে ভর করেছিল টেরই পায়নি।

কাপড় ছেড়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি প্রদীপটা ঝড়ো হাওয়ায় কখন নিভে গেছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সাঁ সাঁ শব্দ খড়ের

বাড়িটার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। জোরে কথা না বললে, ও-ঘর থেকে কিছুই শোনা যায় না। ডাকলাম, মা দেশলাইটা দাও। প্রদীপ জ্বালাতে হবে। অন্ধকারেই দেখলাম দরজায় একটা লম্বা হাত। মা আলো জ্বালাবার জন্য দেশলাই বাড়িয়ে ধরেছেন। আলো জ্বালা হলে দেশলাইটা আবার নিয়ে যাবে। বললাম, তুমি আবার বাইরে দাঁড়িয়ে জলে ভিজছ কেন মা। তোমরা সবাই দেখছি একরকমের।

মা হেসে বলল, আমার কিছু হবে না। তুই আলোটা ধরা তো।

প্রদীপটা জ্বাললে দেখলাম, মা আমার প্রণিপাত করছেন। জল ঝড়ে কার উদ্দেশ্যে এই প্রণিপাত জানি। সামান্য দুটো পেতলের মূর্তি সাক্ষাৎ দেবতার মতো মিটি মিটি হাসছেন তখন। শালগ্রাম-শীলার মাথায় তুলসীপাতাটি চন্দনের গন্ধ ছড়াচ্ছে। বাবার কথা মনে হল। দূর থেকে তিনি কি সব টের পান। তিনি বুঝতে পারেন, আমরা কেমন আছি। বাবা গলায় ঝুলিয়ে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে এসেছিলেন, এখন আমার তালুতে সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কত সহজে তাকে ধারণ করে আছি। পিলু তখন চেঁচিয়ে বলছে, দাদা, বাতাসা সব তুই একা খেয়ে ফেলবি না। আমার জন্য রাখিস। বৈকালির গোনাগুনতি তিনটে বাতাসা। এবং আমার পূজার পালা থাকলে, পূজা শেষে চুরি করে সবটাই খেয়ে ফেলার স্বভাব আছে। প্রসাদ কণিকা মাত্র, এক কণিকা প্রসাদ দিলে পিলু চিৎকার করে বলত, দেখ মা দাদাটা কি রাক্ষস। সব একা একা খেয়ে আমাদের শুধু হাত ছোঁয়াচ্ছে। বৈকালির শেষে, আমার তিনটে দুর্লভ বাতাসাই ঘরে ঢুকে পিলুর হাতে দিয়ে বললাম, পিলু ওঠ। প্রসাদ নে। বলে তিনটে বাতাসা ওর হাতে দিলে সে খুব অবাক হয়ে গেল। বলল, কিরে দাদা, সবই আমাকে দিলি। তুই নে। মাকে দে। প্রসাদ সবাইকে খেতে হয়। বলে পিলু নিজের জন্য একটা রাখল, মাকে একটা দিল, আমাকে একটা। অন্যদিন আমি জানি, পিলু কিছুই পেত না, কণিকা

ছাড়া, আজ পিলুর চেয়ে আমি সদাশয়। পিলুকে বললাম, আমারটা তুই খা পিলু। আসলে মানুষের ঘরবাড়ির মায়া এমনিতেই বাড়ে। পিলুর মতো আমার একটা ভাই আছে বলেই বাড়ে। কিছুক্ষণ আগে টের পেয়েছি, বাবার ঘরবাড়িতে পিলুর বেঁচে থাকা কত দরকার। সে না থাকলে অন্ধকার কি গভীর তাও জানি। সামান্য একটা বাতাসা দিয়ে তা কেনা যায় পিলুর আশ্চর্য অকৃত্রিম খুশীর হাসিটুকু না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

॥ এগার ॥

সকালেও পিলুর জ্বরটা সারল না। মা গায়ে হাত দিয়ে বলল, দেখি। পিলু হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, বলছি তো জ্বর নেই। মা তবু কপালে হাত রেখে বলল, জ্বর আছে। বের হবে না কোথাও। সকালে কিছু খাবে না। দুপুরে বার্লি। পিলু রেগে গেল। বলল, কিছু খাব না! জ্বর আছে! সে মুখ ভেংচাল মাকে।
—আমার শরীর, আমি বুঝি না, তুমি বোঝ।
অগত্যা আমার পালা। হাত দিয়ে দেখলাম, গায়ে জ্বর বেশ। বললাম, যা শুয়ে থাকগে। ঘোরাঘুরি করলে জ্বর বাড়বে।
বেশ রোদ উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার। গাছপালা সকালের হাওয়ায় তির তির করে কাঁপছে। কুকুরটা দু' দিন হল বাড়ি ফিরছে না। বাবার মতো কেমন বাউণ্ডুলে স্বভাবের। এক দণ্ড বাড়ি ঘরে তিষ্টোয় না। কেবল সারা মাঠ, এবং সড়কে ঘুরে বেড়াবে।
গতকাল আমাদের এমন একটা আশঙ্কার দিনেও কুকুরটা রাতে ফিরে আসেনি বলে পিলু বসে বসে গজগজ করছিল। আসলে আমরা বুঝতে পারি কুকুরটা কোথায় আছে খুঁজে দেখার নাম করে পিলু এখন একটু মাঠঘাটে অথবা গাছপালার অভ্যন্তরে ঘুরে আসতে

চায়। আমি বললাম, ঠিক আসবে। যাবে কোথায়।

—এলে দেখ না কি করি! খেতে পাবে না ভেবে পিলুর মেজাজ চড়ে যাচ্ছে। কাউকে সকালে খেতে দেওয়া হোক পিলু এখন সেটাও চাইছে না। পিলুর জ্বরের সঙ্গে সামান্য সর্দি কাশি আছে। সামান্য বাসক পাতার রস দিলে খুব কাজে আসত। বাবা থাকলে কোন ঝামেলা ছিল না। ঠিক জঙ্গল থেকে এটা ওটা খুঁজে এনে রস করে দিতেন। অবশ্য বাবা অসুখের তিন-চারদিন না দেখে কিছু করার পক্ষপাতী নন। আমরা গত শীতে যে সামান্য জ্বর জ্বালায় ভুগেছি তাতে টের পেয়েছি, অসুখ বিসুখে আমার বাবা বড়ই নিস্পৃহ। কেবল পাঁচদিনের মাথায় যখন সর্দি কফ বুক থেকে নড়ানড়ি করার নাম করছে না তখনই বাবা বলেছিলেন, বাসক পাতার একটা গাছ লাগানো দরকার। বাসক পাতা, তুলসী পাতা, শিউলী পাতা আর আদার রস, একটু লোহা পুড়িয়ে দেব। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মা বলেছেন, বাসক গাছ কোথায়?

—আরে লাগালেই হবে।

—গাছ লাগাবে, বড় হবে, পাতা হবে, তবে রস হবে। সে তো এ-জন্মে হবে বলে মনে হচ্ছে না।

বাবা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ধনবৌ তোমার জিভ বড়ই ক্ষুরধার। মা, বাবার এই উক্তিতে খুবই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। জ্বর জ্বালা হলে লোকে ডাক্তার ডাকে। একটা কিছু করে। তা না করে মানুষটা কেবল বসে বসে হিতোপদেশ ঝাড়ে। কিছু বললেই জিভ ক্ষুরধার হয়ে যায়। উচিত কথা বলা যাবে না। মা আর অসুখ বিসুখ নিয়ে বাবাকে একটা কথা বলেনি। ছ'দিনের মাথায় আমার বুকের কফ নড়ে উঠল। সাতদিনের মাথায় বেশ তরল হয়ে গেল। বাবা স্নান করতে বললেন। অবগাহন স্নান। এবং অবগাহন স্নানের পরই শরীর কেমন ঝরঝরে হয়ে গেল। তারপর তিন দিন তিন রাত মানুষের

শরীর সম্পর্কে প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা কে কি বলে গেছেন, ফাঁকে ফাঁকে তা মার প্রতি সামান্য কটাক্ষ হেনে বলতেন, শরীরের নাম মহাশয়, বাকিটা বলতেন না। যেন ভাবটা এই বুঝে নাও আর সব।

বাবার চিকিৎসা শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি আছে এটা বোঝা গেল বিকেল বেলায়। বাবা বিকেলের ট্রেনে ফিরে এসে পিলুকে বাড়ি দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন। পিলু এমন নিরীহ শান্ত-শিষ্ট হয়ে জলচৌকিতে বসে আছে, আসলে পিলু না অন্য কেউ, যেন চশমা থাকলে খুলে দেখতেন। বাবার পোঁটলা-পুঁটলি এবার খুবই ছোট সাইজের। বাবা সামান্য নুয়ে বারান্দায় উঠে এলে পিলু বেশ ক্ষীণ গলায় বলল, মা, বাবা এসেছে। আমি ঘরে অঙ্ক করছিলাম। বাইরে বের হয়ে এলাম। মায়া রান্নাঘর থেকে, আর মা রান্নাঘর থেকেই বলল, বসতে দে। বাবা বুঝতে পারলেন এবারের দোষ ত্রুটি একটু বেশি মাত্রায় হয়ে গেছে। মার অতিথিপরায়ণতা দেখেই বুঝি সেটা টের পেয়েছেন। বের হলে ঘরে ফেরা কবে হবে যেন তিনি নিজেও ঠিক জানেন না। ঘোরাঘুরি করার সময় মানুষ জন, ট্রেনে ভ্রমণ, শিষ্যবাড়ির গুরু ভোজনে মনে থাকে না, বনভূমিতে একটা তাঁর আবাস রয়েছে। চিঠিপত্র দিতেও ভুলে যান। না তাঁর মনে হয়, কালই তো ফিরছি, কাল আবার যে কি কালে গ্রাস করে ফেলে, কারণ রোজই তাঁর বাড়ি ফেরার উদ্যোগ আয়োজন করার সময়ই বুঝি মনে পড়ে যায়, লক্ষ্মণ মল্লিকের সঙ্গে কতদিন দেখা নেই, যখন এসেছেন, তখন ঘুরেই যাবেন। এমন সব বহুবিধ লক্ষ্মণ মল্লিক বাবার ঝোলায় রয়েছে। ফলে প্রতিদিনই একবার করে বাড়ি ফেরার তাগিদ, একবার করে লক্ষ্মণ মল্লিকদের তাগিদ। ফলে দুই তরফের ঠোকা-ঠুকিতে বাবার শেষ পর্যন্ত বুঝি চিঠি লেখাটাও হয়ে ওঠে না। বাড়ি ফিরেই বাবা টের পেলেন, মা আর ধনবৌ নেই, সুপ্রভা দেবী হয়ে আছেন। তখন সামান্য গলা খাকারি দিলেন। মেজ পুত্রটিকে বললেন,

তোমরা সবাই ভাল আছ তো? মাকে জ্বালাওনি তো? তবু যখন ভেতর থেকে কোনো উচ্চবাচ্য নেই, আমাকে বললেন, মান্নুর কাছে গেছিলি? পরীক্ষা কবে জেনেছিস? আমি গেছিলাম কি গেছিলাম না ওটা বড় কথা নয়। আসলে বুঝি বাবা কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না! মায়া তখন বলল, জান বাবা, ছোড়দাকে সিংগি মাছে আঙুল ফুঁড়ে দিয়েছে। দাদার জ্বর হয়েছে।

পিলু বলল, হ্যাঁ বলেছে, আমার জ্বর হয়েছে! না বাবা, কিছু হয়নি। মা আমাকে কিছু খেতে দিচ্ছে না।

বাবা এবারে বলল, দেখি কোথায় ফুঁড়েছে।

মা ভেতর থেকে খুবই নিরুত্তাপ গলায় বলল, দেখো, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী এসেছেন, দেখো।

বাবার মুখটা খুবই অসহায় দেখাল। পিলুর আঙুলটা খুবই ফুলে আছে। বাবা মার বিদ্রূপ এতটুকু গায়ে মাখলেন না। আঙুলটা বিশিষ্ট চিকিৎসকের মতোই টিপে টিপে দেখলেন। তারপর বললেন, ভয় নেই সেরে যাবে। মায়া, একটা ছোট্ট বাটি দিতে পারবি। কারণ বাবা এবং মায়ের মধ্যে অদৃশ্য খোঁচাখুঁচি আরম্ভ হলেই আমরা সংসারে ভীষণ গুরুত্ব পেয়ে যাই। বাবা এখন সব কথাই আমাদের সঙ্গে বলবেন। মাও। যেন বাবা মাকে চেনেন না। অথবা দুজনই দুই বিপরীত মেরুতে বসে অদৃশ্য সুতো জুড়ে আমাদের মাথায় টরে টক্কা বাজাচ্ছে।

পিলু বলল, বাবা, কাল আমি ভাত খাব?

—খাবে।

বাবা এখন কল্পতরু। সুপ্রভা দেবী বুঝোন সংসারে তার দাম কম নয়। পিলু বুঝি ভাবছে, আর কি চাওয়া যায়। মায়া তখন ছোট্ট একটা বাটি এনে দিলে বাবা কোথা থেকে অনেকটা ভেরেণ্ডার কস নিয়ে এসে হাতে লেপ্টে দিলেন। বললেন, রাতে শোবার সময় আর একবার। সকালেও দেবে। আঙুলের ফোলা কমলে জ্বরও সেরে যাবে।

পরদিন পিলুর জ্বর সেরে যাওয়ায় সুপ্রভা দেবী আবার সংসারে ধনবৌ হয়ে গেল। বাবাকে বলল, কিগো চানটান করবে না! কত বেলা হল? কখন ঠাকুরঘরে ঢুকবে!

বাবা জমিতে গাছপালা লাগাবার সময় কথা কম বলেন। আজ সকাল থেকেই গাছপালা লাগাবার কাজে ব্যস্ত। কত সব শেকড়-বাকড় নিয়ে এসেছেন তিনি। পোঁটলাপুঁটলি খুললে টের পেয়েছিলাম একটাতেও প্রণামীর কাপড় কিংবা চাল ডাল বলতে কিছু নেই। ছোট ছোট অঙ্কুরের মতো গাছ আর শুধু শেকড়-বাকড়। বাবা একটা মূল তুলে রোপণ করছেন আর কাঠি পুঁতে দিচ্ছেন। বলছেন এটা হল হরতকী গাছের চারা। এখানে পুনর্ণবার ঝাড়, এদিকটায় থানকুনিপাতা, এখানে থাকল গন্ধপাদাল। বাসকের ডাল লাগাবার সময় জায়গাটার উর্বরা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিল। বাবা ডালটা তুলে একটু অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ কাঠা খানেক জমি জুড়ে তিনি আজ যাবতীয় ভেষজ রোপণে ব্যস্ত। কারো কথায় কর্ণপাত করার সময় এটা নয় বুঝে মা সটকে পড়েছে। কেবল পিলু পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কুকুরটা রাতে ফিরে এসেছে। সে পিলুর পায়ের কাছে বসে লেজ নাড়ছে।

বাবা গাছ লাগাবার সময় কোন গাছে কি ফল দেবে বলে যাচ্ছেন। আর কি-ভাবে সংগ্রহ করেছেন, তিনি এই শেকড়-বাকড়ের জন্য কতদূর গিয়েছিলেন তার আদ্যোপান্ত বিবরণ। সব জায়গায় সব গাছ হয় না। কিন্তু এখানকার যা মাটি তাঁর ধারণা সব গাছই ফলবতী হবে। একটা অর্জুনের বিচি পুঁতে বললেন যদি গাছটা হয়, দেখবে কি সুন্দর তার ডালপালা। গাছের ছাল হৃদরোগের মহৌষধ। হালিশহরের পঞ্চানন কবিরাজ বীজ দিল। পঞ্চানন কবিরাজ বলল, কর্তা নিয়ে যান, সব সময় পাওয়া যায় না। সব বীজ থেকে গাছও হয় না। আমার কাছে এই অমূল্য রত্নটি পড়ে আছে এখন কাকে দিই ভাবছিলাম। আপনার মতো সদাশয় মানুষের হাতে বীজ কথা বলতে

পারে। নিয়ে যান, যদি কথা বলে। পিলুর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, তোর কি মনে হয়, গাছটা হবে তো ?

পিলু বলল, তুমি লাগালে সব হয় বাবা।

পিলু এই কথাটা যেন আরও জোরে বলে, এমন ইচ্ছাতে বাবা বললেন, তুই কি শরীরে জোর পাস না ?

পিলু বলল, পাই তো !

না, ভাল মনে হচ্ছে না। তোমার শরীরটা ঠিক হচ্ছে না পিলু, ভেতরে ভেতরে ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে হয়তো। খাওয়া দাওয়া ভাল দরকার। দুধ খেতে হবে।

দুধ খেতে হবে বললেই আর খাওয়া হয় না। মানুষের ঘরবাড়িতে একটি সবৎসা গাভী কত দরকার, পিলুর দিকে তাকিয়ে যেন সেটা মনে পড়ে গেল। বাবা তারপর কি ভাবলেন, দুপুরে খেতে বসে বললেন, বুঝলে ধনবৌ, সবই তো হয়ে গেল, চাঁপাকলার গাছও বড় হচ্ছে। এবারে কার্তিক অঘ্রানে ছড়া পড়বে। চাঁপাকলা দুধ হলে বেশ হয়। বারান্দায় খেতে বসে বাবার দুধ খাবার বাসনার কথা ভেবে মার চোখে কি যেন সংশয় দেখা দিল। বলল, এই তো ঘুরে এলে। কটা দিন অন্তত বাড়ি থাক। কারণ মা বুঝি বুঝতে পারে ঠিক সবৎসা গাভীর সন্ধানের অজুহাতে বাবা আবার বাড়ি থেকে উধাও হবার ধান্ধায় আছে।

—পিলুর দুধ খাওয়া দরকার। বাবা নিজের প্রয়োজনের কথা না বলে পুত্রদের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দিতে চাইলেন।

মা বলল, পাবে কোথায় ?

সত্যি কথাটা ভেবেই বাবা খাবার ব্যাপারে অত্যধিক মনোযোগী হয়ে গেল। এতগুলো টাকা একসঙ্গে—না ভাবা যায় না।

পিলু বলল, নবমী বলেছিল, একটা ছাগলের বাচ্চা দেবে বাবা। নিয়ে আসব ?

এই নিয়ে বছরখানেক ধরে একটি ছাগলছানা আনার জন্য কতবার বাবার কাছে পিলু আর্জি পেশ করেছে। বারবারই বাবার প্রত্যাখ্যানে পিলু চেয়ে আনতে সাহস পায়নি। মোক্ষম সময় বুঝে আবার পিলু কথাটা পাড়ল।

বাবা বললেন, বামুনের বাড়ি এটা। বামুনের বাড়িতে ছাগল পোষে না।

সুতরাং যতই দুধের প্রয়োজন থাকুক একটা ছাগলছানা তার জন্য এনে হাজির করা যায় না। পিলু কি ভাবল কে জানে, ক'দিন পর ঠিক একটা ছাগলছানা বগলে করে নিয়ে এল। বাবা হয়ত প্রথম বকাঝকা করবে, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এখন দরকার আপাতত ছাগলছানাটিকে বাবার চোখের সামনে থেকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে রাখা। আমাদের পাঁচ বিঘে ভুঁইর শেষ দিকে, যেখানে একটা ইটের ভাঙা পাঁচিল আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে এখনও গাছপালার জন্য রোদ আসে না. তার পাশে নিরিবিলি একটা জায়গায় ভাঙা ইটের খুপরি বানিয়ে ফেলল পিলু। ছাগলের বাচ্চাটাকে কিছু ঘাস দিল খেতে। বাবা সারাদিন ওদিকটায় বড় যায় না।

কেন যায় না রহস্যটা অবশ্য অনেকদিন পর আবিষ্কৃত হয়েছিল। এবং যেহেতু সেদিকে যায় না, পিলুর কাছে সব চেয়ে নিরাপদ মনে হয়েছিল জায়গাটাকে। সে আর বাড়ির দশটা কাজের কথা ভুলে গেল। কখন ডেকে উঠবে কে জানে। এই ভয়ে সারাদিন ঘাসপাতা খাওয়াল গোপনে। বাবা যখন সন্ধ্যায় নিবারণ দাসের আড়তে জম্পেস করে আড্ডা দিতে রওনা হল তখনই পিলু ছাগলের বাচ্চাটাকে বগলে করে একেবারে বাড়ির মধ্যে।

এবং আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম, আপাতত বাচ্চাটাকে রান্না-ঘরে রাখা যাক। ও-ঘরটায় বাবা পারতপক্ষে ঢোকেন না। কারণ এ এলাকার সবটাই সুপ্রভা দেবীর একান্ত নিজস্ব। ভেতরের দিকে ছোট

বারান্দায় খাওয়া দাওয়ার পাট। বাবা শুধু দরজায় উঁকি দিলে দেখতে পাবেন। এতসব ভেবে বাচ্চাটাকে রাখা গেল ঠিক, কিন্তু ফল কি হবে, ছাগলের বাচ্চা, বুদ্ধি আর কতটা হবে, দুপুর রাতে সহসা ত্রাহী চিৎকার। বাবা ধড়ফড় করে উঠে গেলেন। আমরা সবাই। শেয়ালের উপদ্রব হতে পারে ভেবেও পিলু টু শব্দটি করছে না। কারণ বাবার কি মর্জি হবে কে জানে। তখনই বাবা বললেন, কিসে ডাকে।

মা বলল, তাই তো!

বাবার জীব-জন্তুর প্রতি মমতা এমনিতে একটু বেশি। সাপ-খোপের বেলায় এটা যথার্থ টের পেয়েছি। তিনি খুব উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, তাড়াতাড়ি লম্ফটা জ্বাল ধনবৌ। মনে হচ্ছে শেয়ালে ছাগলের বাচ্চা ধরেছে। বাইরে বের হয়ে লম্ফের আলোতে কোথায় বাচ্চাটা খোঁজাখুঁজি করতে থাকলেন। কোথা থেকে এল, অথবা এখানে ব্যারাকে যে সুবাদার সাবের ছাগল রয়েছে, বাচ্চাটা তারও হতে পারে, পথ ভুলে চলে আসতে পারে, ঘরে এখন ডাকছে—তিনি হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকলেন।

আশ্চর্য, পিলু আগের মতোই লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। সে উঠছে না, নড়ছে না। পিলু জোরে জোরে নাক ডাকতে থাকল।

বাবা বললেন, কোথায় দেখছি না তো! রান্নাঘর থেকে বাচ্চাটা মানুষের সাড়া পেয়ে আরও জোর গলায় ব্যাঁ ব্যাঁ করতে থাকল। দু-তরফের ডাকাডাকিতে বাবাকে সত্যি কথাটা বলে দিলে এখন বেশ হয়, পিলুকে জব্দ করা যায়। পিলুর নাক ডাকানি বন্ধ করা যায়—তখনই মা বলল, দাঁড়াও। মনে হচ্ছে রান্নাঘরে আছে। মা রান্নাঘরে ঢুকে গেলে বাবাও ঢুকে গেলেন। বাচ্চাটা দেখে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকলেন বাবা। মেজ পুত্রটির কাজ, ছাগলের জন্য কত হরেক রকমের কচি ঘাস, ছেঁড়া আসন, জলের পাত্র—সাদা রঙের একটা কচি বাচ্চার সেবাযত্নের বহর দেখে বাবা বোধ হয় ধীরে ধীরে

সম্বিৎ ফিরে পেলেন। কিছু বললেন না। সোজা শোবার ঘরে ঢুকে বললেন, হয়েছে, এবারে নাক ডাকা বন্ধ কর বাবাধন। সঙ্গে সঙ্গে পিলু কেমন নির্জীব হয়ে গেল। নাক ডাকল না আর। বললেন, ওঠ। কথা আছে।

পিলু উঠে বসল।

বললেন, নাম এবার।

পিলু নেমে এল।

—কোথা থেকে চুরি করেছিস?

—চুরি না তো বাবা!

—তবে লুকিয়ে রেখেছিস কেন?

—তুমি দেখলে যদি কষ্ট পাও। বামুনের বাড়িতে ছাগল পুষতে হয় না যে বলেছিলে।

—সত্যি, তবে নবমী দিয়েছে? না বুড়িটাকে ঠকিয়েছিস? না বলে কয়ে নিয়ে এসেছিস?

পিলু আমার দিকে তাকাল। পিলুর সাংঘাতিক বিপদের সময় আমি তার বড়দা হয়ে যাই। সেই একবার নবমীর কাছে আমাকে নিয়ে গেছিল। পিলুর প্রতি নবমীর ভক্তি স্বচক্ষে দেখেছি। পিলু আমার দিকে তাকিয়ে আছে—যদি আমি ওর হয়ে কিছু বলি।

বাবা ফের বললেন, একটা গরীব ভিখিরি বুড়ি, তিন কুলে কেউ নেই, জঙ্গলে থাকে, কত কষ্টে থাকে আর তুই না বলে না কয়ে···

পিলু বলল, আমাকে সত্যি দিয়েছে বাবা। চুরি করে আনিনি।

পিলুর অসহায় মুখ দেখে আমারও কষ্ট হচ্ছিল। বাড়িঘর হয়ে যাবার পর বাবা মাঝে মাঝে দু-এক ঘা আজকাল পিলুকে দিয়ে থাকেন। এই পুত্রটির উপদ্রবে দু-একজন পড়শী ইতিমধ্যেই নালিশ জানিয়ে গেছে। এখন বাবা বাড়িতে কিছুদিন আছেন বলে, মার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই এবং এই সূত্রে বাবার শাসনের অধিকার বোঝাই যাচ্ছে আজ একটু বেশি। মা'ও যে বলবে, হয়েছে থাক, নিয়ে যখন এসেছে

থাক, নবমীকে জিজ্ঞেস করলেই হবে—সেই মাও কেমন চক্রে জড়িত হয়ে পড়ায় পিলুর হয়ে সাফাই গাইতে সংকোচ বোধ করছিল। অগত্যা আর কি করি, বললাম, না বাবা, পিলু সেই ছেলেই নয়। নবমী ওকে দাঠাকুর ডাকে। নবমীকে পিলু ফল পাকুড় দেয়। পাতা কেটে দেয়। শুকনো কাঠ দিয়ে আসে। শীতে মরে যাবে ভেবে পিলু মাকে না বলে নবমীকে একটা পুরনো শাড়ি পর্যন্ত দিয়ে এসেছে। মারবে ভেবে মা তোমাকে কিছু বলেনি।

বাবা পিলুকে আর একটা কথাও বললেন না। সহসা পুত্রগৌরবে বাবার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে দু-চোখ বাবার জলে ভার হয়ে গেল। বললেন, তোদের একটু ভাল কিছু খাওয়াতে পারি না। ছাগলের বাচ্চাটা বড় হয়ে যদি একটু তবু দুধ দেয়। তারপর কেমন দুঃখী মানুষের মতো নিজেকে মশারির মধ্যে গুটিয়ে নিলেন। আর বোঝাই গেল না, বাবা আমার এ-বাড়িঘরেই আছে। এ-বাড়িঘরেই থাকে।

॥ বারো ॥

এই বনভূমিটা তার জঙ্গল গাছপালা নিয়ে আগে একরকমের ছিল, মানুষের বাড়িঘর হয়ে যাওয়ায় এখন অন্যরকমের। দূরে দূরে দরমার বেড়া দিয়ে মানুষজন ঘরবাড়ি কেবল তুলছেই। বনভূমিটা ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছিল। তবু বাবা তার বাড়িঘরে নিয়ে আসছেন যাবতীয় ফুল ফলের গাছ। যেমন বাবা এর মধ্যে গোটা কয়েক আমের কলম পুঁতেছেন। নারকেল গাছ দুটো। একটা সফেদা ফলের গাছ, পেয়ারা তিনটে, লেবুর কলম কিছু রোপণ করেছেন বাড়িটাতে। আর পেঁপে গাছগুলি বুড়ো হয়ে যাওয়ায় নতুন কিছু পেঁপের চারা। করমচা লাগিয়েছেন টক ডাল খাবেন ভেবে। অর্থাৎ

দেশ বাড়িতে বাবার যা কিছু ছিল, এই আবাসে প্রায় তার সবই তিনি এনে হাজির করার চেষ্টা করছেন। কিছুই বাদ দিচ্ছেন না। এক একদিন বাবা ফিরতেন এক এক রকমের গাছের সংবাদ নিয়ে। একবার মাঝে বাবা দশ ক্রোশ দূরে হেঁটে গেছিলেন, শুধু শহরে মানু কাকার এক বন্ধু বলেছিল, বাড়িতে তার একটা জামরুল গাছ আছে। গাছটার কলম বাঁধার জন্য একবার যেমন দশ ক্রোশ হেঁটে গেছিলেন, আবার কলমটি আনার জন্যও তাঁকে দশ ক্রোশ ভাঙতে হয়েছিল।

জঙ্গল সাফ করে যত এগিয়েছি, তত গাছগুলো বাবা পুঁতে গেছেন। শুধু বিঘা দুই ভুঁই শাক-শব্জীর জন্য আলাদা রেখে দিয়েছেন। আর বাবার গাছপালা-অন্ত প্রাণ ছিল বলে, এক একটা গাছের পরিচর্যায় বড় সময় দিতেন। ঋতু বদলের সঙ্গে গাছের গোড়া কুপিয়ে সামান্য শেকড়-বাকড় আলগা করে বর্ষার জল খাওয়াতেন। কোন গাছে কি সার দরকার বাবার চেয়ে কেউ ভাল জানত না। ফলে এই বছর দুই যেতে না যেতেই জমির রুক্ষ ভাবটা কেটে গেছে। ছায়া শীতল এক সুষমা বাড়িটার চারপাশে গড়ে উঠছে, আমরা ধীরে ধীরে টের পাচ্ছি। আর বাবার সঙ্গে এই গাছপালা, কুকুর, ছাগলছানা বাড়িঘর আমাদের নতুন এক সাম্রাজ্য। দূরে রাজবাড়ি। যেখানে পূজায় মেলা বসে, যাত্রাগান হয়। হাতী দেখা যায়। শহরে গেলে সুন্দর সুন্দর মেয়েদের দেখা যায় ফ্রক পরে স্কুলে যাচ্ছে। নিমতলায় গেলে আজকাল মানুষজনের অনেক মুখ দেখা যায়। আর রয়েছে মাঠ, বাদশাহী সড়ক, ল্যাংড়া বিবির হাতা, বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ি। পৌষে মেলা বসে। এইসব মিলে আমাদের ঘরবাড়ির চারিদিকে বেঁচে থাকার এক আশ্চর্য রহস্যময়তা গড়ে উঠেছিল। বাবা কত সহজে আমাদের একটা নতুন পৃথিবী উপহার দিলেন।

যারা বাড়িঘর করছে, অথবা নতুন বাড়িঘর করে চলে এসেছে, তারা অনেকেই সপরিবারে আজকাল আমাদের বাড়ি আসে। মা তাদের

বসতে দেয়। বিকেলবেলায় মা মায়াকে নিয়ে কখনও নতুন নতুন বাড়িতে বেড়াতে যায়, গল্প করে এবং কখনও দেখা যায়, ওদের কেউ দিয়ে গেছে বড় একটা লাউ। পঞ্চানন চন্দ, কাঙ্গালী আইচ সকাল হলেই আসে। ঠাকুর ঘরের দাওয়ায় মাথা ঠোকে। চরণামৃত নেয়। মুখে মাথায় মাখে। ওদের ছেলেরা মেয়েরা মাকে মাসিমা ডাকে। বাবাকে মেসোমশাই। কত দূর দেশে সবার বাড়িঘর ছিল! অথচ সব কিছু ফেলে আসার শোক ক'দিনেই মানুষের বুঝি উবে যায়। নতুন এক জীবন, মানুষেরা বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করে নেয়। বাবা ট্রেনে এখন কোথাও গেলে টিকিট কাটেন। বিনা টিকিটে ভ্রমণ করা আজকাল পছন্দ করেন না।

এরই মধ্যে একদিন বাবা একটি খবরের কাগজ নিয়ে এলেন। এই কাগজ আমরা বাড়িতে বসে গোল হয়ে প্রথম পড়ি। বাবা কাগজটা সারাদিন পড়লেন। পরদিনও পড়লেন। বাবার কাছে খবরের কাগজ পড়াটা একটা সম্ভ্রমের ব্যাপার। বাবা কাগজের খবরগুলি নিয়ে নিবারণ দাসের আড়তে সন্ধ্যায় ঘুরে এলেন। এবং সব খবর দিয়ে ভাব দেখালেন—বাবা খুব হেজিপেঁজি মানুষ আর নন।

পূজার মাস আসছে, একটা দুর্গাপূজার বায়না পাওয়া যায় কিনা, সেই আশায় তিনি প্রায়ই বহরমপুরে গিয়ে মানুকাকার বাসায় আজকাল বসে থাকছেন।

আর আসা যাওয়া করতে করতে একদিন বাবা খুব বড় একটা খবর নিয়ে এল। বলল, বুঝলে ধনবৌ, কালুবাবুর মার কাজ। খুব দেবে থোবে মনে হয়। বেলডাঙা স্টেশনে নেমে যেতে হবে। খুবই ধনী ব্যক্তি কালুবাবু। একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের খোঁজে এসেছিল মানুর কাছে। তা কালই রওনা হয়ে যাব। মানুকে বলে রেখেছি, শহরেও তো অনেক সার্বজনীন পূজা হয়—একটু খোঁজখবর রাখিস। বিলুটা তো বড় হয়ে গেছে। ওকে তন্ত্রধার করে নেব। কিরে বিলু পারবি না?

তন্ত্রধারের কাজটা কি আমি জানি। ধুতি পরতে হবে। নামাবলী গায়ে দিতে হবে। দেবীর সামনে আসনে বসে পুরোহিতদর্পণ আওড়ে যাব। কথা শুনে শুনে বাবা দেবীর নামে মন্ত্রপাঠ করবেন। বাবাকে কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। এতসব মানুষের মধ্যে আমি বাবার পুত্র, আমার খালি গা, জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ, দেবীর মুখে গর্জন, ধূপ ধুনোর গন্ধ, চন্দনের গন্ধ আর আমি বাবার পুত্র হয়ে বসে আছি ভাবতেই ভারি বিভ্রমে পড়ে গেলাম। বাবাকে ঠিক আগের মতো আর অত সহজে বলতে পারলাম না, হ্যাঁ পারব বাবা। কি যেন একটা সংকোচ অথবা লজ্জা বলা যেতে পারে মনের মধ্যে তির তির করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

বাবা ফের বললেন, অন্য তন্ত্রধার নিলে সে তো ভাগ নেবে। পুরোহিত-বরণ পাবে। পাঁচ দশ টাকা দক্ষিণা পাবে। সেটা তুই গেলে ঘরেই আসবে। কোনো অসুবিধা হবে না। যেখানে ঠেকে যাব, সেখানে একটু ধরিয়ে দিবি।

মা বলল, পূজার দেখা নেই। হবে কি হবে না এখন থেকেই···

—এই তো ধনবৌ, সবটাতেই আগ বাড়িয়ে বাধা। হবে না কে বলেছে! কী হয়নি! তারপর কালুবাবুর মতো ধনী ব্যক্তির বাড়িতে বাবার চণ্ডীপাঠে আমন্ত্রণ—কোথায় ওঠা গেছে, ধনবৌ বুঝেও কেন যে বোঝে না বাবার মুখ দেখে এমন মনে হল আমাদের।

বাবা ফের বললেন, বিগ্রহের কৃপায় সবই হচ্ছে, বাকিটুকু হবে। একটা গরু হয়ে গেলে দেখবে, তোমার আকাঙ্ক্ষার কত নিবৃত্তি।

আমরা বুঝতে পারলাম, বাবার মনে শুধু এখন একটাই দুঃখ, সন্তানদের পাতে সামান্য দুধ দিতে পারছেন না। দুঃখটা ঘোচাবার তালে আছেন সেটা ক'দিন থেকে বাবার কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারছি। এখন শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় সেটাই দেখার বিষয়।

পিলু পাশেই ছিল। ছাগলের বাচ্চাটার জন্য একটা খোঁয়াড় তৈরি

করছে। সে বলল, দাদা না গেলে আমি যাব বাবা। আমি ঠিক পারব।

আমি বললাম, তুই গেলেই হয়েছে! পরের বারে বাবা আর পূজাই পাবে না।

পিলু বলল, কেন পাবে না?

মা বলল, লোকে ভাববে ছানাপোনা দিয়ে কি কাজ হয়! আর তন্ত্রধার পেল না! ঠাকুরমশাই-এর কি ভীমরতি হয়েছে!

বাবা খুব গম্ভীর গলায় বললেন, পাবলে পিলুই পারবে। তোকে পিলু আমি সব শিখিয়ে দেব। এবং কথা হল, একটা পুরোহিতদর্পণ বাবা যে-করেই হোক সংগ্রহ করবেন। কোথায় পাওয়া যেতে পারে, পঞ্জিকাটা না হয় প্রতিবছর নিবারণ দাসই এনে দেয়, কিন্তু পুরোহিত-দর্পণ! বার বার বোধহয় মনে হল, কালুবাবুর কাছে তাঁর এই বাসনা নিবেদন করলে তিনি দয়াপরবশে দিয়েও দিতে পারেন। মানুষই তো দেয়। তবে আর ভাবনা কেন!

অবশ্য বাবার কাছে একটা পুরনো পুরোহিতদর্পণ থাকার কথা। দেশ বাড়িতে দুর্গাপূজা বাঁধা ছিল। আসার সময় ওটা আনতে ভুলে গেছেন, না হারিয়ে গেছে বাবার কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল না। শুধু বললেন, কাল চণ্ডীপাঠ। বোধহয় বাবা এখন মনে মনে হেঁকে উঠবেন, কাল চণ্ডীপাঠ। কতবড় একটা ঘটনা এটা ছেলেরা যদি বুঝতো! ধনবৌ যদি বুঝতো! বাবা সকাল সকাল স্নান করলেন। ঠাকুরঘরে আরও সকালে ঢুকে গেলেন। একটা নতুন গামছায় বাবার সব অমূল্য গ্রন্থাদি সযত্নে বাঁধা। ঠাকুরের সিংহাসনের ওপর ওটা রাখা থাকে। বাবার যা কিছু জরুরী কাগজপত্র, সবই ঐ গামছায়। এমন কি দলিল দস্তাবেজ। তা ছাড়া বাবার ধারণা, ঠাকুরের মাথার ওপর থেকে হাত দিয়ে কেউ কিছু সরাবার তালে থাকলে, অপহরণকারী ধনে জনে মারা পড়বে। ফলে টাকা পয়সা ঐ একটা গামছায়। ঠাকুর ঘরে যেহেতু আমার প্রবেশ করার

অনুমতি আছে, সিংহাসনের সবটাই ঘেঁটেঘুঁটে দেখার সৌভাগ্য হয়। বাবার গামছার পুঁটলি খুলে যা যা দেখেছিলাম—একটা তালপাতার পুঁথি। কতকালের জানি না। স্বহস্তে লিখিত কার সেটা বাবা নিজেও জানেন না। বাবার বাবার, না তস্য বাবার, কোন বাবার জানা ছিল না বলে, আমার পিতৃদেব সেটি লাখ টাকার সামিল ভাবতেন। ওতেই পুরো চণ্ডীর বর্ণনা আছে। নিবারণ দাসের দেওয়া পঞ্জিকা, একটা রুদ্রাক্ষের মালা আর নানারকম গাছগাছালির গুণাগুণের একটি বই। দুটো তামার পয়সা। কাশীর কোন এক সাধু বাবাকে দিয়েছিল। এই পয়সার গুণে সংসারে কোনো অপমৃত্যু ঘটবে না। একটা আসন, ওটা কার দেওয়া বাবা আজ পর্যন্ত বলেনি। আসনটাতে বাবা বসেন না। সব সময় তোলা থাকে। আর কিছু লাল নীল পাথর। এগুলি দিয়ে কি হবে বললেও বাবা ভীষণ অহংকারী হয়ে যেতেন। রেখে দাও। তোমাদের একদিন বলেছি, আমার জিনিসে হাত দেবে না। কিছু ভূর্জপত্র। সঙ্গে আমার আর পিলুর ঠিকুজী কুষ্ঠি। গামছার পুঁটলিটাতে যখন পুরোহিতদর্পণটা নেই, তখন ওটা খোয়া গেছে ধরে নেওয়া গেল। থাকলে ওটা পুঁটলিতেই থাকত।

কোথাও পূজা-আর্চা থাকলে বাবা খুব সকাল সকাল ঠাকুরঘরে ঢুকে যান। সূর্য উঠতে না উঠতে কোনো দিন পূজাও শেষ হয়ে যায়। সকালে প্রাতঃস্নান সেরে নেন তাড়াতাড়ি। জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ করেন। এবং গলায় পৈতার যে কী মাহাত্ম্য বাবাকে এই সময়টায় না দেখলে বোঝা যাবে না। একেবারে পরম নিষ্ঠাবান মানুষ। পৃথিবীতে হিংসা-দ্বেষ আছে, চুরি-চামারি, কোর্ট-কাছারি আছে, যুদ্ধ আছে, সিনেমা-বায়স্কোপ আছে, নাটক-নভেল আছে কিছুতেই বিশ্বাস করা যেত না। শুধু ঠাকুরঘর, আমরা ক'জন আর মার ব্যস্ততা বাবার ব্যস্ততা, ফুল, জল, তিল, তুলসী, দূর্বা প্রভৃতির মধ্যে বাবা একসময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে শাঁখে ফুঁ দিয়ে কাঁসি বাজিয়ে যখন বের

হতেন, তখন হয়তো পিলু দুলে দুলে পড়ছে। বাবা বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি বের হচ্ছে সুবাদে পিলুর পড়ায় এত উৎসাহ। যত খুশী থাকবে, তত তাড়াতাড়ি হবে কাজকর্ম। বের হতে সময় লাগবে না। পিলু সুপুত্র হওয়ার তখন প্রাণপণ চেষ্টা করত।

আজ বাবার কোথাও যাবার কথা নেই। পূজাআর্চা থাকলে, ঘটা করে আগের দিনই সবাইকে বাবা জরুরী খবরটা দিয়ে রাখেন। মায়া খুব সকালে উঠে ফুল দূর্বা তুলে রাখে। ভাইটা মার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়বে ভেবে, আমার পাশে রেখে যায়। বাবাকে জলখাবার যা হোক কিছু, এই মুড়ি খৈ অথবা যবের ছাতু। বাবা যবের ছাতু জলে ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খেতে খুব ভালবাসেন। মাকে তার আগে ঘরদোর লেপে ফেলতে হয়। ঠাকুরঘরের বাসনপত্র মেজে রাখতে হয়। বাবার সঙ্গে মারও কাজের তখন অন্ত থাকে না। অথচ আজ এত সকালে কেন বাবা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন। পিলু মাদুর বিছিয়ে মাত্র পড়তে বসেছে, দেখে বাবা ঠাকুরঘরে পদ্মাসনে বসে আছেন। সে ভেবে পেল না, সুপুত্র হবে, না ছাগলটাকে নিয়ে ঘাস খাওয়াবে এখন। বাবার তো যাবার কথা নেই কোথাও। সে তবু খুব ভাল ছেলের মতো বলল, বাবা তুমি কোথাও যাচ্ছ?

—কেন রে?

—না এমনি, এত সকালে ঠাকুরঘরে তুমি···

বাবা বললেন, পড় পড়। লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে। কেবল আমি কখন বের হব সেই তালে থাকে।

পিলু ধরা পড়ে গিয়ে খুব লজ্জায় পড়ে গেল। সে পড়তে থাকল গলা ফাটিয়ে। ছাগলের বাচ্চাটা কি মরে গেছে! কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে দু-পাতা পড়ে মাকে বলল, বাচ্চাটা রা করছে না কেন মা?

বাবা ঠাকুরঘর থেকেই বললেন, বাচ্চাটা রা করছে না কেন তা তোমার মা কি করে বলবে!

—আমি একবার দেখে আসব?

বাবা বুঝতে পারলেন বুঝি পুত্রটি বাচ্চাটা সম্পর্কে নাছোড়বান্দা। বললেন, দেখে আয়। না দেখলে তো শান্তি হবে না। দেখে এস। তারপর একটু পড়ে আমার ঘরবাড়িকে উদ্ধার কর।

বাচ্চাটা দেখে এসে পিলু বলল, খুব খিদে পেয়েছে বাবা।

কার খিদে পেয়েছে, পিলুর না বাচ্চাটার ঠিক বোঝা গেল না। বাবা তখন পূজায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন। এখন পিলু পড়ল কি পড়ল না, সংসারে কোথায় কি হচ্ছে জানার কোনো উৎসাহ নেই। তিনি আচমন করার পর কোনো কথাই বলবেন না। তারপর গণেশের পূজা আরম্ভ হবে। বাবা জোরে জোরে বললেন, খর্ব স্থূলতং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদর সুন্দর এবং আরও সব মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হলে পিলু বইটই ভাঁজ করে প্রথম কুকুরটাকে ডাকল, মনা মনা। মনা তো ছুটে এসে পায়ে গড়াগড়ি। সে এবার বাচ্চাটাকে বগলে নিল। পিলুকে বের হয়ে যেতে দেখে মা আর চুপ করে থাকতে পারল না—পিলুরে তোর কি হল? সাত সকালে কিছু মুখে না দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিস! তোর বাবাকে ডাকবো! পড়াশুনা লাটে ওঠালি!

পিলু জানে সব অহেতুক। বাবা আর কথা বলছেন না। যতই মা চেঁচামেচি করুক বাবা পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন বাক্য নয়। কটু বাক্যও নয়। বরং মার চেঁচামেচি যত আরম্ভ হবে, বাবার মন্ত্রপাঠের স্বরগ্রাম তত উঁচুতে উঠবে। ততক্ষণে মাও আরম্ভ করে দিয়েছে যেমন বাপ, তেমন ছেলে। একটা কথা বলছে না! হ্যাঁগো শুনতে পাচ্ছ, পিলু ছ্যাখো কোথায় বের হচ্ছে!

—কোথায় বের হব আবার! বাচ্চাটার খিদে পায় না! একটু ঘাস পাতা ছিঁড়ে খাওয়াব তাও তোমার সহ্য হয় না মা। বাচ্চাটাকে না খাইয়ে শেষ পর্যন্ত তোমরা সবাই মারবে।

অকাট্য কথা। বাচ্চাটা খেল কি খেল না সংসারে আর কারো দেখার অবসর নেই। সেই দেখে থাকে। বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে না খাইয়ে মেরে ফেলে সে তো পাপের ভাগী হতে পারে না। সুতরাং সে

সোজাসুজি কিছু গ্রাহ্য না করে বের হয়ে গেল। বগলে ছাগলের বাচ্চা, পায়ে পায়ে কুকুরটা। পিলু এখন সোজা হেঁটে চলে যাচ্ছে। ঘরবাড়ির প্রতি তার এখন এতটুকু আকর্ষণ নেই। বাবা যতই মন্ত্রপাঠ করুন, যতই রাগে দুঃখে স্বরগ্রাম একবার উঁচুতে একবার নিচুতে নামিয়ে আনুন, পিলুর কিছু আসে যায় না। আসলে সে বাবাকে বোবা বানিয়ে রেখে চলে যাচ্ছে। ফিরে আসার পর এই বাবা আর সেই বাবা থাকবে না। এইটুকুই পিলুর ভরসা। সে এখন পরিত্যক্ত বনভূমিতে, নবমীর ইটের ভাটায়, ঝোপ জঙ্গলে রাজার মতো ঘুরে বেড়াবে। আমরা বুঝে নিয়েছি, বাবা বিদেশে, পিলু স্বদেশে—দু'জনই সমান। দুজনে কোন ফারাক নেই। পিলু ফিরে এলে মার সামনে বাবার তখন কোন সাহসও নেই কিছু বলার। কারণ কোথাকার জল কতদূর গড়াবে কেউ বলতে পারে না। বোবার শত্রু নেই। এই মহামন্ত্র সম্বল করে বাবা তখনকার মতো সব সামলে নেবেন।

॥ তেরো ॥

এইভাবে আমাদের দিন যায়। বাবা কালুবাবুর মার কাজে চণ্ডি-পাঠের জন্য সকালে রওনা হয়ে গেলেন। বেলডাঙ্গা থেকে বাবাকে সাত ক্রোশের মতো পথ হেঁটে যেতে হবে। সকালের ট্রেনে স্টেশনে নামলে, রাতে রাতে পৌঁছে যাবেন। পরদিন কাজ। বাবা নামাবলী গায়ে বগলে পুঁথি, হাতে ব্যাগ। আমরা বাবাকে বাদশাহী সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছি। বাবা যেতে যেতে পিলুকে অমৃতবাণী শোনাচ্ছিলেন। পিলু এক কান দিয়ে শুনছে, অন্য কান দিয়ে বের করে দিচ্ছে।

বাবা বললেন, তোমরা ভাল হয়ে থেকো।

পিলু বলল, থাকব বাবা।

—মার কথা শুনবে।

পিলু বলল, তুমি কবে ফিরবে বাবা ?

বাবা খুবই বিস্মিত গলায় বললেন, কাজ হলেই ফিরে আসব।

—কবে কাজ শেষ হবে বাবা ?

—কালই হবে।

—কতদিন লাগবে ফিরতে ?

মনে হল বাবা হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। বললেন, কালই ফিরে আসতে পারব বোধহয়।

আমি বললাম, বোধহয় কেন বাবা ?

আসলে এত সব প্রশ্ন করার সাহস আমার কিংবা পিলুর কারো নেই। বাবা আমার দিকে তাকালেন। পিলুটা না হয় বেয়াদপ হয়ে গেছে, মায়ের আসকারাতে জাহান্নমে যেতে বসেছে, তাই বলে তুমিও! বাবা আমার দিকে তাকিয়েই কিছু আঁচ করতে পারলেন। বললেন, তোমার মাকে বল, কাল রাতেই ফিরব।

সকাল থেকেই মার সঙ্গে বাবার বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। কেন বাক্যালাপ বন্ধ থাকে আমরা দু ভাই আজকাল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। বাবার কোথাও যাবার সময় হলেই মা আজকাল কিছুটা যা দেবী সর্বভূতেষু হয়ে যায়। কেবল গজগজ করে। কথা দিয়ে বাবা কথা রাখে না, একটা মানুষ বাইরে বাইরে ঘুরলে, খবর না পাওয়া গেলে কত চিন্তা হয়, মানুষটার যদি সেই আক্কেল থাকে! ছেলেরা বড় হয়ে গেল, এই ধরনের অজস্র কথা, আর যত অভাব তখন মার বেড়ে যায়। খুব সামান্য উপকরণ সম্বল করে বাবার সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিতে পারে তখন।

বাবাকে বাদশাহী সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম আমরা। বাবা হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছেন। আমাদের দিকে হাত তুলে বললেন, বাড়ি যা। রাস্তায় অন্য সব অনেক কাজের কথাও বলেছেন। তার মধ্যে আমায়

বড় কাজ মামুকাকার কাছে যাওয়া। বাবার জন্য কার কি হয় জানি না, আমার ভারি কষ্ট হয়। গতকাল বাবা সারাদিন চণ্ডীপাঠ করে ঝালিয়ে নিয়েছেন। সংসারে কি হল না হল, একবারও মুখ বার করে দেখেননি। পিলু কখন ফিরে এল, কখন কে খেল, ভাইটা এখন হাঁটতে পারে, দৌড়তে পারে, সেই ভাইটা ছবার ঠাকুর-ঘরে মুখ বাড়িয়ে ডেকেছে, বাবা, বাবা, কোনো উত্তর দেননি। চণ্ডীপাঠের মধ্যে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে মা না পেরে আমাকে বলল, দেখ তো তোর বাবার বাহ্যজ্ঞান আছে কি না? আমি মার কথায় কোনো গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু মা না খেয়ে বসে আছে। বাবা বাড়ি থাকলে যতই বেলা হোক মা খায় না। বাবার খাওয়া হলে মা পাতেই বসে যায়। সেই মানুষ, বেলা পড়ে গেছে কখন, গাছের ছায়া লম্বা হতে শুরু করেছে, এবং যখন সাঁজ নেমে আসার আর তেমন দেরিও নেই, তখনই মা না পেরে কথাটা বলেছিল। মার কথায় গুরুত্ব না দেওয়ায়, পিলু দেখলাম দায়িত্বটা সহজেই নিয়ে নিল। সে সোজা ঠাকুরঘরে গলা বাড়িয়ে ডাকল, বাবা।

বাবা চোখ উন্মীলন করে সামান্য তাকালেন। তারপর ফের চোখ বুজে পড়তে গেলে, সে বলল, বাবা!

বাবা সোজা হয়ে বসলেন।

পিলু বলল, মা জানতে চেয়েছে…

বাবা তাকিয়েই আছেন। বোধহয় সামান্য বাকি আছে। সেটুকু শেষ করে কথা বলবেন।

পিলু শেষ করল কথাটা, মা জানতে চেয়েছে, তোমার বাহ্যজ্ঞান আছে তো!

বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য। ছেলেটার কোনো দোষ দিয়ে লাভ নেই।

পিলু বলল, সাঁজ লেগে যাচ্ছে।

বাবা চণ্ডীপাঠ অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়লেন। শুধু বাইরে এসে

বলেছিলেন, চণ্ডীপাঠে ঘরবাড়ির সব অকল্যাণ দূর হয়। জীবনে খাওয়াটাই সব নয়।

মা খোঁচা হজম করে গেল। তখনকার মত কিছু বলল না, পরে বাবাকে খেতে দিয়ে নিজে আর খেল না। খাওয়া নিয়ে খোঁটা শেষ পর্যন্ত! বাবা তারপর সাধ্য সাধনা করলেন অনেক। মার দিক থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি। এবং আজ সকালেও অভিমানবশে মা জলগ্রহণ করেনি। বাবার অনেকদূর পর্যন্ত যেতে হবে বলে জলগ্রহণ না করলে চলে না। বাবার জন্য মা সবই রান্নাবান্না করেছে। বরং অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশিই করেছে, নিজে খায়নি। বাবা বলেছে, কপাল। দুভার্গ্য বলতে পার। আমাকে বলেছে, তোমার মার সবই ভাল, তবে বড্ড জেদ। যাই হোক, আমি তো কাজে যাচ্ছি, খেতে বল। না খেয়ে যেন থাকে না। গৃহলক্ষ্মী অভুক্ত থাকলেও ঘরবাড়ির অকল্যাণ হয়। কথাটা বুঝিয়ে বল।

বাড়ি ফিরতেই মা বলল, কবে ফিরবে কিছু বলে গেল?

পিলু বলল, কালই।

—আর কাল! মা কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল।

আমি বললাম, বাবা বলেছে তোমাকে খেয়ে নিতে। না খেলে সংসারের নাকি অকল্যাণ হয়।

বাবা বাড়ি নেই বলে মার কাজে কর্মে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। প্রথম দাওয়ায় বসে রাস্তায় বাবার সঙ্গে আমাদের কি কি কথা হল সব শুনল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হরেন মল্লিক এসেছিল। মঙ্গলচণ্ডী পূজা।

বাবা বাড়ি না থাকলে সাধারণ পূজাআর্চার কাজ এখন আমাকেই করতে হয়। পালা পার্বণে বাবা আজকাল একা পেরে ওঠেন না বলে, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজার সময় বাড়ি বাড়ি আমিও যাই। প্রথম প্রথম খুবই ভুল হত। বাচ্চা ঠাকুর বলে যজমানরা ক্ষমাও করে দিত।—ও কর্তা সংকল্প করলেন না। ও কর্তা প্রাণ প্রতিষ্ঠা

করলেন না। মূর্তি পূজা থাকলে প্রায়ই ভুল হত চক্ষু দানের সময়। কাজল যেমনকার তেমন পড়ে আছে। একটুও আঁচড় পড়েনি। মাঝে মাঝে মন্ত্রপাঠ গুলিয়ে ফেলতাম—মনে থাকত না, বাবার কথামত তখনই গায়িত্রী জপ করে সংকট থেকে ত্রাণ পেতাম। বাবার মতে গায়িত্রী পাঠের মতো মহামন্ত্র আর কিছু নেই। বামুন ঠাকুরের ওটা ব্রহ্মাস্ত্র বলতে পার। সুতরাং পূজায় অসুবিধায় পড়লেই বাবার ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রয়োগ করতাম। ফলে পূজাআর্চায় ভয় ভীতির চেয়ে, খেয়ে না থাকার কষ্টটাই বেশি। যেমন এই এখন, আমাকে স্নান-টান সেরে সড়কের ও-পাশে যে নতুন কলোনি হয়েছে, যেখানে হরেন মল্লিকরা থাকে সেখানে ছুটতে হবে। তারপর বাড়ি ফেরা বাড়ির বিগ্রহে ফুল জল দেওয়া, এবং এত সবের পর খাওয়া। দুপুর গড়িয়ে যাবে। মেজাজটা খুবই বিগড়ে গেল। বললাম, পিলুকে বলে করতে। আমি পারব না।

পিলু এক পেট খেয়ে এক পায়ে খাড়া। কারণ দ্বিতীয়বারের সময় হতে হতে সে দুটো পূজাই শেষ করে ফেলতে পারবে। পূজা করার সময় সে বিধি বিধান গ্রাহ্য করে না। মোটামুটি গণেশের পূজা আর পঞ্চদেবতার পূজা জানা আছে। বাকিটা তো এষ গন্ধ পুষ্প, অথবা দীপায় নম, নৈবেদ্যায় নম—আর বামুন ঠাকুর যা বলবে—সবই ঈশ্বর দু হাত পেতে কড়জোড়ে গ্রহণ করবে—সুতরাং তার ভয় ভাবনা এত কম যে, মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যানের সময় সে অত্যন্ত তদ্গতচিত্তে গণেশের ধ্যান জপ করে যাবে। বিন্দুমাত্র সংশয় থাকবে না কারো যে সে এক দেবতার পূজা করতে এসে অন্য দেবতার পূজা সেরে উঠে যাচ্ছে।

চুল বড় চোখ বড় পিলুর। চোখ দুটোতে ওর আশ্চর্য এক ভালবাসা। সব কিছুতেই সে পা বাড়িয়ে থাকে। পেট ভরা থাকলে, সব কাজই সে কত সহজে করে আসতে পারে। চারপাশে তাকালে বোঝা যায় পিলু সব সময় এই বাড়িঘরের জন্য ঠিক বাবার মতো অহংকারী।

আমি বললাম, তুই তো ঠিক মন্ত্র পড়িস না!

—কে বলেছে!

—তুই লক্ষ্মীর ধ্যান জানিস?

—হ্যাঁ।

—বল তো।

—ওম পাশাঙ্ক মালিকাম্ভুজ···এইটুকু বলেই বলল, তারপর কি রে দাদা?

—ঐ তো!

—কেন বাবা তো বলেছে না পারলে. গায়িত্রী পাঠ করতে।

—তাও তুই করিস না।

—দক্ষিণা কম দিলে কি করব?

—দক্ষিণার সঙ্গে পূজার কি সম্পর্ক রে!

—বারে সব জিনিসের দাম দর থাকে, খাঁটি জিনিসের এক দাম, ভেজাল জিনিসের এক দাম, দক্ষিণা কম দিলে কম মন্ত্র, বেশি দিলে বেশি মন্ত্র।

আমি মার দিকে তাকিয়ে বললাম, শুনছ মা, পিলু কি বলছে!

মা বলল, ঠিকই তো বলছে। তোমার বাবার মতো হলে সংসার চলে না।

সুতরাং ঠিক হল, পিলুই যাবে হরেন মল্লিকের পূজা সারতে। আমি যাচ্ছি না। সে কিছুক্ষণ ঘাস পাতা সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকল। ছাগলের বাচ্চাটা এই পরিবারের আর একজন হয়ে গেছে। তার নামকরণ পর্যন্ত করে ফেলেছে পিলু। অনেক ভেবেচিন্তে নাম রেখেছে রত্না। গতকাল থেকেই সংসারে পিলু, বিলু, মায়ার মতো, মনার মতো বাচ্চাটা আমাদের এক পরিবারভুক্ত জীব। পিলুকে যদি কেউ বলে সংসারে তোমরা ক'জন প্রাণী, সে গর্বের সঙ্গে বলবে আটজন। দেশ থেকে আসার পর আরও দুজন বেড়েছে।

এবং পিলু বাচ্চাটাকে ঘর বার করে থাকে। একটা বস্তা বিছিয়ে

দেয়। হেগে মুতে বস্তাটা নোংরা করে ফেলে বলে, সন্ধ্যা বেলা দেখা গেল পিলু রত্নাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। রত্নাকে বলছে, তোমার বড়ই স্বভাব খারাপ। মুতে নাও বলছি। রত্না যত ঘরের দিকে ছুটতে চাইছে, তত শক্ত হাতে দড়ি ধরে রেখেছে। বলছি না মুতে নিতে। মুতে দিলে রান্নাঘর নোংরা হয় না।

দুদশবার বলার পর সত্যি রত্না শিড়দাঁড়া লম্বা করে দিল। এবং মুতে দিল। পিলুর অদ্ভুত আত্মতৃপ্তির হাসি। এই সংসারে মনার মতো রত্নাও তার কথাবার্তার মান সম্মান রাখছে। সে ঘরে নিয়ে রত্নাকে শুধু বেঁধেই রাখল না, রাতে খিদে পেলে যাতে খেতে পায়, সেজন্য কিছু ঘাস পাতা দড়িতে বেঁধে মুখের সামনে ঝুলিয়ে রাখল। ঘুম ভাঙলে চেঁচামেচি করার সুযোগ পাবে না। সামনে দেখতে পাবে কচি ঘাসপাতা। শুধু একটাই ভয় পিলুর, শিয়ালে না নিয়ে যায়। এ জন্য সে মনাকে কয়েকবার শাসিয়েছে। পাহারা দেবার জন্য রান্নাঘরের ঠিক দরজার সামনে শুয়ে থাকতে বলেছে। এবং রাতে যখন পড়াশোনা সেরে খেতে বসেছি, দেখি, ঠিক রান্নাঘরের দরজার এক পাশে মনা মুখ তুলে বসে আছে। পিলু কিছু খেয়ে বাকিটা তুলে নিয়ে গেল। মনাকে খাইয়ে বলল, কোথাও যাবে না। তোমারও দেখছি বাউণ্ডুলে স্বভাবে পেয়েছে। যখন খুশি যেদিকে চলে যাও। ঘর বাড়িতে ফেরার কথা মনে থাকে না।

মা বলল, তোমরা সবাই একরকমের। শুধু মনাকে দোষ দিয়ে কি হবে।

তারপর আমাদের এই বাড়িঘরে রাত ক্রমে গভীর হতে থাকে। টের পাই রত্না চোখ বুজে জাবর কাটছে, মনা ঘরের দাওয়ায় মুখ গুঁজে শুয়ে আছে, একটা পাতা পড়ার শব্দে সতর্ক, কান খাড়া হয়ে উঠছে। বাড়িঘরের গাছগুলি বর্ষার জল পেয়ে সতেজ—বনভূমিটা পায়ে পায়ে সরে যাচ্ছে। আর ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে টোপরের মতো বাড়িটা তুলে নিতে পারছে না। মা শুয়ে শুয়ে কেবল সারাক্ষণ

আমাদের সুসময়ের গল্প বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। গল্পে সারাক্ষণ বাবার কথাই ঘুরে ফিরে আসছিল। বুঝতে পারি মা বাবার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। মা হয়ত ঘুমিয়েও বাবার স্বপ্নই দেখছে। স্বপ্নে বোধ হয় এই ঘর বাড়ির মাথার ওপর রয়েছে তেমনি আকাশ, দূরবর্তী নীহারিকাপুঞ্জ। বাবা নীলবাতি হাতে মাঠ পার হয়ে ক্রমে বাড়িঘরের দিকে এগিয়ে আসছেন।

॥ চোদ্দ ॥

যথারীতি বাবা তাঁর কথামত রাতে ফিরে এলেন না। মানুষটা আসবে ভেবে মা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসেছিল। আমি রাত জেগে অঙ্ক কষছিলাম। বাকি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা দরজায় হেলান দিয়ে—কেমন নিরুপায় রমণীর মতো মুখ তার। মাঝে মাঝে উঠোনের দিকে চোখ সরে যাচ্ছে। কোনো শব্দে মা সতর্ক হয়ে উঠছে। এবং সারা মাঠঘাট জ্যোৎস্নায় ডুবে। উঠোনে জ্যোৎস্না। গাছের মাথায় বনভূমিতে জ্যোৎস্না। যেন জ্যোৎস্না নিরিবিলি আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। শুধু বাবা ফিরে আসেনি বলে সবই কেমন অর্থহীন মায়ের কাছে।

একসময় বললাম, তুমি খেয়ে শুয়ে পড় মা।

মা বলল, দেখি আর একটু।

সুতরাং আবার দুটো ঐকিক নিয়মের অঙ্ক করে বর্গমূলে চলে এলাম। মা একসময় কেমন ছোট্ট বালিকার মতো উবু হয়ে বসল। আমার বইগুলির পাতা উল্টে গেল অযথা। বইয়ের ছবি দেখল। এক একটা ছবির নিচে কি লেখা আছে পড়ল। যেহেতু বইয়ের তাকটা সামনে, বইগুলি নামিয়ে আবার সুন্দর করে ভাঁজ করে তাকে সাজিয়ে রাখার সময় কেমন ছোট্ট বালিকা হয়ে গেল। মার পাশে

বসে থাকতে এখনও আমার ভাল লাগে। মায়ের শরীরে এক আশ্চর্য ঘ্রাণ। অঙ্ক কষতে খুবই ভাল লাগছিল। বুঝতে পারি মা আমাকে মাঝে মাঝে সহসা চুরি করে দেখছে। মুখে সামান্য গোঁফের রেখা, আমি বাবার মতো বড় হয়ে যাচ্ছি, বোধহয় মার কোথাও ভেতরে সন্তান বড় হলে যে সুখ অথবা বাবার মতো একজন পুরুষ মানুষ আমার মধ্যে জেগে উঠছে ভেবে কেমন মুহ্যমান। জননী গো বলতে ইচ্ছে হল একবার। আর তখনই মার দু ঠোঁট কেমন ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি মার দু চোখ কি এক বেদনায় ভার হয়ে গেছে। বললাম, বাবা ঠিক আসবে।

মা উঠে পড়ল। উঠোনে নেমে রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকল। এমনটা তো আমার মা ছিল না। বাবা ফিরে না এলে কখনও এমন বিচলিত বোধ করেনি। উঠোনে নেমে বললাম, বাবা তো প্রায়ই দেরি করে আসে। তবে এত ভয় পাচ্ছ কেন?

মা বলল, তোরা বড় হয়ে যাচ্ছিস বিলু।

বড় হয়ে যাচ্ছি বলে মার ভয়টা কোথায় বুঝতে পারলাম না। আমরা বড় হব না, কাজ করব না, বাবার দুঃখ ঘোচাব না—তবে মানুষের ঘরবাড়ি দিয়ে কি হবে!

মা লাল পেড়ে শাড়ি পরেছে। মাথায় ঘোমটা। আকাশ নীল এবং কোথাও ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছিল। বাবার গাছপালা মার চারপাশে কেমন প্রহরীর মতো সজাগ। তখন মা বলল, বড় হলে তোরাও তো তোদের বাবার মতো হবি। যাবি আর ফিরতে চাইবি না।

তখন বাড়িঘরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি কেউ আমায় দূরে ডাকে। সংগোপনে শহরের সেই ব্যালকনিটা মগজের মধ্যে ভরা থাকে। পায়ের কাছে গোলাপের টব। ইজিচেয়ারে বালিকা ফ্রক গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকে। শীতের পাখিরা আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। এক একটা প্যালক নেমে আসে, এবং জীবনের অর্থ পাল্টে যায়।

বালিকার জন্য বুকে আমার কোথায় যেন টান ধরে গেছে। নিশীথে লণ্ঠনের আলোতে মা আমার মুখ দেখে ধরে ফেলেছে সেটা। বড় হয়ে যাচ্ছি ভেবে দুঃখটা কোথায় মার টের পেয়ে বললাম. মা তুমি ভেব না, আমরা এই বাড়িঘরেই থাকব।

মার মুখে অদ্ভুত কূট হাসি ফুটে উঠল। জ্যোৎস্নায় সেই হাসিটুকু আমাকে সত্যি কষ্টের মধ্যে ফেলে দিল। একটা কথাও আর মাকে বলতে পারলাম না। চুপচাপ ঘরে ঢুকে মাথা গুঁজে বসে থাকলাম। যেন আমি সত্যি এখন আগের মতো এই বাড়িঘরের জন্য টান অনুভব করি না। কেউ নদীর পাড়ে, অথবা গাছপালার অভ্যন্তরে এখন আমাকে নিয়ে হারিয়ে যেতে চায়। মা সেটা টের পেয়ে ভারি নিঃসঙ্গ বোধ করছে।

তারপর মাও আর আমার সঙ্গে কোনো কথা বলল না। খেয়ে নিল। দরজা বন্ধ করে দিল। মশারির ভেতর ঢুকে যাবার সময় শুধু বলল, শুয়ে পড়ার সময় আলোটা কমিয়ে রাখিস। নিভিয়ে দিস না।

মার আশা যে কোনো মধ্যরাতে বাবা ফিরে আসতে পারে। আলোটা সে-জন্য কমিয়ে রাখতে বলল।

শুয়ে পড়ার সময় মনে হল, খুবই নিস্তব্ধ ধরণী। এমন কি কোনো কীটপতঙ্গের আওয়াজ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। মা ঘুমিয়ে পড়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। মা যে ঘুমোয়নি টের পেলাম, কারণ শুয়ে পড়ার সময় মা বলল, দরজায় খিল দিয়েছিস তো!

বললাম, হ্যাঁ মা দিয়েছি। খুব সকালে ডেকে দিও।

—সে দেব। তুমি এখন ঘুমোও।

রাত থাকতে উঠে আবার অঙ্ক নিয়ে বসব ভেবেছি। আসলে এখন বুঝতে পারছি, অঙ্কটা আমার আদৌ করা হয়নি। পরীক্ষার দেরি নেই। দু-একদিনের মধ্যেই ঠিক খবর আসবে কোথায় কবে পরীক্ষা। হপ্তা দুই হয়ত সময় পাব আর। যে করেই হোক দশটা বিষয়েই পাস করতে হবে। নটা বিষয়ে পাস বাবার আমলে চলতে

পারে, এই আমলে দশটা বিষয়ে পাস খুবই জরুরী।

পরদিনও বাবা এলেন না। সকাল সকাল বহরমপুরে কাকার কাছে গেলাম। পরীক্ষা কবে, কোথায় জানা হয়ে গেল। পরীক্ষার সিট পড়েছে কলকাতায়, দ্বারভাঙা হলে। কলকাতা খুবই বড় শহর, মানুকাকা এমন বলেছে। সেখানে কোথায় উঠব, কার কাছে উঠব এই নিয়ে কাকা কিছুক্ষণ সমস্যা বোধ করলেন। তারপর কি ভেবে বললেন, নীলমণির দাদা তো কলকাতায় থাকে। শেষ পর্যন্ত বোধহয় ওখানেই তোমাকে উঠতে হবে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা হয়ে গেল। পিলুর সোজা পথটায় না এসে ঘুরে এলাম। ও-পথটায় সেই ব্যালকনি, টবে গোলাপের গাছ, সামনে ছোট্ট বাগান, এবং জানলায় বালিকার মুখ। ওদিক দিয়ে গেলে শুধু একবার সেই বালিকাকে দেখতে পাব ভেবে ঘুরে এসেছি। সে নেই। তাকে দেখতে না পেয়ে মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। মানুষের বড় হতে হতে কি যে সব হয়। সারা রাস্তাটা বড়ই দীর্ঘ মনে হয়েছিল। মা বাবা ভাই বোন বাদে কোথায় যেন আরও একটা ছোট্ট পৃথিবী বাবার মতো আমি এখন কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বাড়ি এসে দেখলাম, মা বেশ উগ্রচণ্ডা। মা ভীষণ গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে। পিলুকে সকালে বেদম প্রহার করেছে। মায়া ভয়ে ভয়ে মার কাছে ঘেঁষছে না। ছোট ভাইটা পড়ে গিয়ে রক্তপাত ঘটিয়েছে। সকালে যারা দিনক্ষণ তিথি নক্ষত্র দেখতে বাবার কাছে আসে তাদের সবাইকে বলে দিয়েছে, বাড়ি নেই। কবে ফিরবে বললে জানিয়েছে, সে তেনার মর্জি। অন্যদিন সকালে বাবার এ-সব কাজ আমিই করে থাকি। তিথি নক্ষত্র শুভদিন পঞ্জিকায় লেখা থাকে। কেউ ফিরে যায় না।

ফিরতেই মা বলল, তোর মানুকাকা কিছু বলল ?

—কলকাতায় সিট পড়েছে।

—তোর বাবার কথা কিছু ?

বুঝতে পারলাম, মা এখন বাবার খবরের জন্য খুব উদ্বিগ্ন। আমার পরীক্ষা নিয়ে মার কোনো মাথাব্যথা নেই। কি বলি !

একটু ঘুরিয়ে বললাম, কালুবাবু খুব সদাশয় লোক। বাবার মতো মানুষকে পেয়ে ছাড়তে চাননি। দু-একদিন হয়ত ঘুরেফিরে কালুবাবুর ঘরবাড়ি, চাষবাস দেখছেন।

—মানুকাকা তোমায় কি বলল ?

—এই তো বলল।

—বেশ। তাহলে তোমরাও এবার সদাশয় কালুবাবুর বাড়ি গিয়ে ওঠ। সংসারে আমার কারো দরকার নেই।

বাবার ওপর এই প্রথম কেন জানি আমারও ভীষণ রাগ হল। সত্যি তো, আগে একরকমের দিন ছিল, কোথায় কে থাকছে. খুব একটা ভাববার ছিল না। বরং বাবা কোথাও গেলেই কিছু তখন হয়ে যেত। এখন কেন জানি মার এবং আমাদেরও সময় মতো বাবা না ফিরলে চিন্তা হয়। বাবা সেটা কেন যে বোঝে না। মানুষের বাড়ি-ঘরও হবে, বাউণ্ডুলে স্বভাবও থাকবে সে হয় না। দুটো একসঙ্গে মানায় না। মা বোধহয় সে-জন্যই বাবার ওপর এবারে হাড়ে হাড়ে ক্ষেপে গেছে।

মা বলল, তুমি বেলডাঙা স্টেশনে নেমে যেতে পারবে ?

—কোথায় যাব ?

—সদাশয় কালুবাবুর বাড়ি।

—কত দূ···র !

স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ দূর হয়ে গেল !

অগত্যা আর কি করা ! বললাম, যাব।

—কালই সকালে রওনা হয়ে যাবে।

এ-সময়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পিলুটা মার খেয়ে বাড়িঘরের কাছেপিঠে নেই। মায়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাইটা মায়ার

কোলে। সবাইকে মা সকালে বাড়িছাড়া করেছে। কেবল আমি বাকি। এ-সময় কিছু বুঝিয়ে বলাও নিরর্থক। সব কিছুরই মা এখন অন্যরকম অর্থ দাঁড় করাবে। বললাম, ঠিক আছে, যাব।

তারপরই বাবাকে উপলক্ষ করে সেই গজগজ করা, ছেলেরা মানবে কেন! ছেলেরা ভাল হবে কোত্থেকে! সব একরকমের। আমি না হয় কেউ না। ছেলেদের কাছে পর্যন্ত কথা রাখলে না!

মার আঘাতটা কোথায় এতক্ষণে ধরা গেল। আর তখনই দেখি দূরে পিলু চিৎকার করছে, মা বাবা আসছে। মা বাবা একটা গরু নিয়ে আসছে।

মা রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। আমিও। পিলু মাঠ পার হয়ে জোরে ছুটে আসছে। আর চিৎকার—বাবা গরু নিয়ে আসছে।

বাবা অথবা গরু কিছুই রাস্তা থেকে দেখা গেল না। পিলু খবরটা দিয়েই ফের উল্টো মুখে ছুটতে থাকল। মুহূর্তের মধ্যে পিলু মাঠ-ঘাট পার হয়ে বাদশাহী সড়কে উঠে গেল। আশ্চর্য দ্রুতগামী পিলু। তাকে দৌড়ে নাগাল পাওয়া খুবই অসম্ভব। মুহূর্তের মধ্যে সে অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে, আবার দেখা দিতে পারে। আর এত বড় একটা খবর, একটা সত্যি সত্যি আস্ত গরু বাবা নিয়ে আসছে, সে স্থির থাকে কি করে! ডাকলাম, পিলু দাঁড়া।

আমার ডাকে সে সহসা ঝোপঝাড়ের ফাঁক থেকে উঁকি দিল। বলল, আয়। তারপরেই ডুব। রাস্তার দিকে না গিয়ে সে লেংড়ি বিবির হাতার দিকে ছুটছে।

আবার ডাকলাম, দাঁড়া পিলু।

মা সেই বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। মায়া কিছুটা মাঠের মধ্যে, আমি কালীর পুকুর পার হয়ে গেছি—পিলু আরও আগে। সে কোথায় বাবাকে দেখেছে, কতদূরে বোঝা যাচ্ছে না। না কি পিলুর সংশয় আছে, বাবা এই ফাঁকে না আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। বাবা যে একখানা মানুষ! বাবার জন্য সকালে মায়ের জ্বালায় সে বাড়ি-

ছাড়া, সেই বাবাকে যখন কোথাও একটা আস্ত গরুর সঙ্গে আবিষ্কার করা গেছে তখন আর কিছুতেই ছাড়ছে না। সেই জন্যেই মনে হয় পিলু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। গরুটাকে নিয়ে সে তার বাবাসহ মায়ের কাছে ফিরবে।

—ওরে পিলু দাঁড়া!

আর দাঁড়া! সে একবার মুখ ফিরিয়ে বলল, আয় না। ছুটতে পারছিস না!

সত্যি আমি আর ছুটতে পারছিলাম না। সড়কে এসে ভীষণ হাঁপিয়ে গেছি। দেখি, মায়া আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, বাবা কোথায় রে দাদা?

—দেখছি না তো।

—গরুটা কোথায়?

—কিছুই দেখছি না।

—ছোড়দা কোন দিকে গেল?

—লেংড়ি বিবির হাতায় ঢুকে গেল।

আর তারপরই মূর্তিমান তিনজন, বাবা আগে, পেছনে গরুটা তার পেছনে মায়ার ছোড়দা। বাবা একবার ভেসে উঠছে, গরুটা একবার উঠছে, মায়ার ছোড়দা একবার ভেসে উঠছে মেস্তা ক্ষেতের মধ্যে, উঁচু নিচু বলে তিনজনই আবার মেস্তা পাটের জমিতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা খুবই অধীর। কতক্ষণে বাবা এবং গরুটা দূরে আবার ভেসে উঠবে। ভেসে উঠেই আবার ডুবে গেল। এবং এ-ভাবে আমার বাবা মায়ার ছোড়দা আর বাবার গরুটা মেস্তা ক্ষেতের মধ্যে এগিয়ে আসতে থাকল। পেছনে দিগন্ত, তার মধ্যে একটা প্রাণীর দুদিকে দুজন, এবং আমরা সড়কে ভাই বোন, অনেক পেছনে, বাড়ির রাস্তায় মা আর ভাই,—বোঝাই যাচ্ছিল, বাড়িঘরে এটা কত বড় সুখবর। আমি, যে আমি, যে একটু সব তাতেই ইয়ে ইয়ে ভাব সেও, শেষ পর্যন্ত খুশীতে মেস্তা ক্ষেতের মধ্যে ছুটে ঢুকে গেল।

আর গরুটা নিয়ে যখন সে উঠে এল, তখন অবাক।

গরুটা কালো রঙের। শিং ভীষণ লম্বা। শিরদাঁড়া হাড়গোড় বের করা, এ পর্যন্ত সহ্য করা যায়। গরুটা খোঁড়া। চারটে পায়ের মধ্যে একটা নড়বড়ে। পাটা মাটিতে পড়ে না। ঘুরে ঘুরে নড়ে চড়ে বেড়ায়। কিন্তু রাস্তায় বাবাকে ঘাবড়ে দিতে মন চাইল না। কেবল পিলু একবার কি ভেবে বলল, বাবা গরুটার একটা পা ঠিক নেই, না বাবা?

পিলু খোঁড়া শব্দটি উচ্চারণ করল না। যাতে বাবা মনে আঘাত না পান, সেজন্য সে পা ঠিক নেই বলল। বাবার যা চেহারা হাঁটু অবধি কাদা উঠে গেছে, সারা রাস্তা হেঁটে এসে বাবা আমাদের দেখে খুবই গম্ভীর—বাবা এমনটা কখনও থাকেন না, বোঝাই যাচ্ছিল, সারা রাস্তায় বাবা গরুটাকে নিয়ে বেশ ধকল সয়ে তবে পুত্র কন্যাদের জন্য দুধের বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

পিলু শুধু বলল, বাবা আমাকে দড়িটা দাও।

বাবা বলল, না, পারবি না।

— পালাতে পারবে না, দাও না।

বাবা বলল, তুই ধরলেই শুয়ে পড়বে। ওঠানো যাবে না।

আমরা লক্ষ্য করলাম, বাবা গরুটার গলার কাছে বেশ টান রেখেছেন। গরুটাকে বাবা টেনে টেনে নিয়ে আসছেন, আর কি যেন ভয়ে ভয়ে আছেন। বাড়ির কাছে এসে নেতিয়ে পড়লে, শুয়ে পড়লে কেলেঙ্কারির এক শেষ। এত টেনে টেনে বাবা কতক্ষণে নিয়ে যাবে, পিলুর তর সইল না। মা কতক্ষণ ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, ভাইটা—সে লেজটা মুচড়ে দিল একটু তাড়াতাড়ি হাঁটবে বলে। সেই যেমনকে তেমন, পাটা ঘুরে ফিরে পড়ছে, এক পা এগুলে দু পা পিছিয়ে যায় মনে হচ্ছে। ততক্ষণে পিলু বুঝতে পারল, এমন একটা গরু নিয়ে তাদের বাবার পক্ষেই সম্ভব এতটা পথ হেঁটে আসা। কিন্তু এখন পিলু এবং আমাকে যে ভয়টা সব

চেয়ে বেশি কাবু করছিল, সেটা আমাদের মা। আজ বাবার না জানি কি হবে!

বাবা আমাদের সাহস দেবার মতো করে বললেন, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে তো, একটু নেতিয়ে পড়েছে। লেজ মুচড়ে কিছু হবে না।

বাবা এবং গরুর দুরবস্থা দেখে পিলু খুবই বিভ্রমে পড়ে গেল। বলল, জল আনব বাবা, গরুটার জলতেষ্টা পেয়েছে। বলেই সে ছুট লাগালে বাবা বিষম খেলেন। ডাকলেন, আর তো দূর নেই। জলটল বাড়ি গিয়ে দেখানো যাবে। টানাটানিতে গরুর ছাল চামড়া উঠে আসতে পারে ভেবে বাবা বললেন, বিলু ধর তো। দড়িটা টান করে ধর। যতটা সম্ভব টেনে ধরতে গেলে বললেন, আহা লাগবে। ফাঁস লেগে যাবে। অত জোরে নয়। বলে পেছন থেকে বাবা যতটা জোরে পারলেন ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসতে থাকলেন।

সুতরাং বাবা পেছনে, আমি আগে। পিলু কি করবে বুঝতে পারছে না। সে একবার ছুটে বাড়িতে চলে গেল, এক বালতি জল নিয়ে আসতে দেখে বাবা কেমন ক্ষেপে গেলেন। বললেন জলটা গরুকে না দেখিয়ে আমাকে খাওয়াও, কাজে লাগবে। পিলুর এই আচরণ বাবার পছন্দ না বোঝা গেল। সে বলল, কোথা থেকে আনলে বাবা?

বাবার তখন কাছা কাপড় সব খুলে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে বললেন, গরুর মতো গরু। কত দুধ দেবে দেখ।

পিলু বলল, ল্যাংড়া গরু বেশি দুধ দেয় বুঝি বাবা?

বাবা কপালে দুর্গতি আছে অনেক ভেবে বললেন, তা দেয়। তোমাদের জননী কি বলে?

—কিছু বলেনি।

—খাওয়াদাওয়া ঠিক মতো করেছে তো?

—তুমি কাল আসবে বলে গেলে, কৈ এলে না তো।

—কপালে এমন একটা গরু জুটবে কে জানত। বাবা কথা বলছিলেন আর গরুটাকে হেঁইয় মার মার টান বলে ঠেলছিলেন। পিলু মাঝে মাঝে বাবাকে সাহায্য করছে। সেও শীর্ণকায় গরুটাকে যতটা সম্ভব বাবার সঙ্গে ঠেলতে ঠেলতে মার এজলাসে হাজির করতে চাইল।

গরুটাকে নিয়ে বাড়ির রাস্তায় উঠতেই মা সহসা হাউ মাউ করে উঠল, ওমা একি গো, হাড়মাস বের করা গরু, একটা ল্যাংড়া গরু!

বাবা এ-সব সময়ে খুবই রাশভারি হয়ে যান। মার কাছে এসে বাবা আরও গম্ভীর। এতটা পথ হেঁটে জ্যান্ত একটা গরু নিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছনো গেল সে-জন্য এদের যদি এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ থাকে। বাবা ভীষণ ঘর্মাক্ত কলেবরে গরুটাকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে বারান্দায় সোজা বসে পড়লেন। তারপর ক্লিষ্ট গলায় বললেন, জল।

বাবার কাছে যেতে কেউ আমরা সাহস পাচ্ছিলাম না। বাবা কখনও বিষয়ী মানুষ হয়ে গেলে ভয় পেতাম। যেন আঙুল উঁচিয়ে বলা, বসে নেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত করছি তবু সুখ পাই না। তিনি সে-সবের কিছু বললেন না। মাও বুঝতে পারছিল না, সেবা শুশ্রূষা কার আগে দরকার। বাবার না গরুটার। মায়া ইতিমধ্যে ছুটে এক গ্লাস জল এনে দিলে সবটা বাবা এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললেন। মা তাড়াতাড়ি তালপাতার পাখা এনে বাবাকে বাতাস করতে লাগল। আমরা উঠোনে গরুটার সঙ্গে ঠায় দাঁড়িয়ে। পিলু ফাঁক বুঝে গরুটার তেজ দেখার জন্য বাঁটে হাত দিলে বাবা তেড়ে উঠলেন, লাথি-ফাতি খেয়ে মরবে দেখছি সব।

গরু পা তোলা তো দূরে থাক, এতটুকু নড়ল না পর্যন্ত। পিলু বলল, ভারি ঠাণ্ডা গরু বাবা।

আমার মনে হল ঠাণ্ডা গরু না বলে সম্ভ্রান্ত গরু বলা ভাল। বাবা হয়ত এখন তাই বলতেন। কিন্তু মা কেমন বিমূঢ়ের মতো বলল, হ্যাঁগা দেখছ গরুটা তো নড়ছে-টড়ছে না।

—নড়বে নড়বে! অত তপ্ত খোলা হলে হয়! কতটা পথ হেঁটে এসেছে।

--তাই বলে গরুর লেজ নাড়া বন্ধ থাকে কখনও!

—সবই নাড়বে। সময় দিতে হয়। এই বিলু, বাবা গরুটাকে একটু জল দেখা তো!

এতটা পথ হেঁটে এসে সত্যি গরুটা এতক্ষণে জীবিত না মৃত বাবারও বোধহয় সংশয় ছিল। বাজপড়া প্রাণীর মতো উঠোনে দাঁড়িয়ে। মার ভয়ে কিছুতেই বুঝি সত্যি কথাটা বলতে পারছেন না। জল দিলে বোঝা যাবে। এক বালতি জলও গরুটার সামনে রাখা গেল। তবু সে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। পিলু ছুটে গিয়ে আহ্লাদে এক আঁটি ঘাসও তুলে এনেছে। তাও দৃকপাত নেই।

মা বলল, ওমা কি গরু গো, ঘাস খায় না, জল খায় না। নড়ে না চড়ে না।

বাবা প্রায় উঠে বসল এবার।—আরে খাবে খাবে। ঠাণ্ডা হয়ে নিক খাবে।

—আর খেয়েছে! মা বোধহয় দু হাত ছুঁড়েটুড়ে বাবার কাণ্ড দেখে কাঁদতে বসে যাবে এবার।

বাবা তেমনি আমাদের সবাইকে সাহস দিয়ে যাচ্ছেন।—ভাল গরু। জাত ভাল। দুধ দেবে। গেরস্থ বাড়িতে গরু না থাকলে মা লক্ষ্মী থাকেন না। কতটা পথ হেঁটে এসেছে। গরু বলে কি আরাম বিরাম থাকতে নেই।

মানুষটাও অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। সঙ্গে গরুটা। হাঁটু অবধি কাদা। চোখমুখ কোথায় ঢুকে গেছে। সারারাত গরুটাকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটাহাঁটির চিহ্ন। দু দিন আগে বের হয়ে গিয়েছিলেন।

ফিরেছেন আজ। চণ্ডীপাঠের নাম করে শেষপর্যন্ত সোজা একটা ভাগাড়ের গরু নিয়ে হাজির। কার এত কৃপা হল মানুষটার ওপর! মা বাবাকে দেখতে দেখতে বোধহয় এ-সবই ভাবছিলেন। রাগে দুঃখে চোখ ফেটে বোধহয় এবারে জল বের হয়ে আসবে।

মার চেহারা দেখে বাবা ঘাবড়ে গিয়ে পায়ের ওপর পা রেখে নাচাতে থাকলেন। খুবই তেজী অহংকারী মানুষ। ভেঙে পড়লেই গেছে। সংসারে আগুন জ্বলে উঠবে। বলছিলেন, হবে হবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। গরুটা দুধ দিতে থাকলেই তোমার আর দুঃখ থাকবে না ধনবৌ!

এবং এবারে দেখা গেল গরুটা সত্যি লেজ নাড়াচ্ছে। বাবা লাফিয়ে উঠলেন। ওগো দ্যাখো লেজ নাড়াচ্ছে। বাবার বুকে যেন দ্বিগুণ বল এসে গেল।—বললাম, গরু লেজ নাড়াবে না সে হয়। দে রে জল দে।

জলের বালতিটা আবার মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। গরুটা নাক টানল দুবার। মুখ খানিকটা জলে ডুবিয়ে ফের তুলে নিল। খেল না।

বাবা বললেন, ফ্যান আছে ধনবৌ, থাকলে দাও না। একটু নুন মিশিয়ে দাও।

মা ফ্যান এনে নুন মিশিয়ে দিল। না, খাচ্ছে না। শত হলেও গরু, একটু আদর যত্ন চায়। মা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে বুঝল, রুক্ষ কাঠ, কঙ্কাল বাদে গরুটার আর কোনো সম্বল নেই। মা অগত্যা বলল, খাবে কি? শরীরে কিছু নেই।

—বাঁধা খাওয়া সইবে কেন? ছেড়ে খাওয়ালে দেখবে দু দিনে ঠিক হয়ে যাবে।

মা এতক্ষণ যা বলতে চেয়েছিল, এবারে তা বলে ফেলল, কে দিল গরুটা? বের হলে তো চণ্ডীপাঠের নাম করে। আর নিয়ে এলে একটা মরা গরু! কার এমন কৃপা হল কর্তার ওপর। আর লোক

পেল না। ভয়ে বাবা মার দিকে না তাকিয়েই বললেন, কালুবাবুই দিল। সবৎসা গাভীর কথা পাড়তেই ওনার দয়া হল। বলল, গোয়াল থেকে রাইমণিকে নিয়ে যান। ভাল জাতের গরু। বয়স হয়েছে। তবে কার বয়স না হয় বলুন!

বাবা দেখছি আসলে গরু নিয়ে আসেনি, নিয়ে এসেছে রাইমণিকে।

মা কেমন স্বগতোক্তি করল—কি যে তার এত দায় ছিল, এমন অবলা জীবকে এমন একজন অবলা মানুষের জিম্মায় তুলে দেওয়া।

আমরা যে ঝড়ের আশংকা করেছিলাম, দেখলাম সেটা কেটে গেছে। মা গরুটার জন্য ছুবেবো তুলতেও বলল মায়াকে। বুড়ো হোক, গায়ে কিছু না থাক, সাক্ষাৎ ভগবতী। রাইমণির জন্য বাবা আমাদের নিয়ে একটা নতুন দড়িও পাকালেন। খালের জলে ঘষে ঘষে স্নান করানো হল সাক্ষাৎ ভগবতীকে। বেশি জোরে ঘষা গেল না, ঘষতে গেলেই রাইমণির ছাল চামড়া উঠে যাচ্ছে। স্নান-টান সেরে রাইমণি ঘাস এবং জল দুই খেয়ে ফেলল।

রাইমণিকে বাবা আমি এবং পিলু মিলে যখন ঠেলাঠেলি করে জল থেকে তুলে আনছিলাম, শেষবারের মতো মা বলেছিল, গরুটাকে দিয়ে কালুবাবু ভাল করেনি। ভোগাবে। বাবা তখন কেমন শোকসন্তপ্ত গলায় বললেন, দানের গরু আর কত ভাল হবে ধনবৌ? সংসারে এত করেও কিছু করা গেল না। তোমাকে সুখী করতে পারলাম না। খুব ভালমানুষের মতো বাবা রাইমণিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যে ভারি দুঃখী মানুষ কিছুতেই কাউকে টের পেতে দিচ্ছেন না। তখন বাবার জন্য আমার কেন জানি চোখে জল আসছিল। বললাম, রাইমণি কি সুন্দর দেখতে, না?

বাবা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, সত্যি বলছিস?

—হ্যাঁ বাবা। রাইমণি সত্যি ভাল। নিরীহ।

বাবা বললেন, এখন কত কাজ। দাঁড়িয়ে থাকিস না। রাইমণির

একটা ঘর করতে হবে। দুলেকে ডেকে আনতে হবে। দুলে এলে সবাই মিলে সাঁজ লাগতে না লাগতেই রাইমণির পাতার ঘর বানিয়ে ফেললাম। বাঁশের বন থেকে বাঁশ এল। কাশের বন থেকে কাশ। পাটের দড়িতে বাতা বেঁধে দিলাম। বাবলা গাছের খুঁটি। খুঁটিতে রাইমণিকে বেঁধে বাবা বাড়ির কোণায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কি দেখছেন। সাঁজ লেগে গেছে। সারাটা দিন বাবা একদণ্ড বসে নেই। এখনও এই সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এত কি দেখছেন!

ডাকলাম, বাবা!

অন্ধকারে সম্বিৎ ফিরে পাবার মতো বললেন, বিলু!

—হ্যাঁ বাবা।

—এদিকে আয়।

কাছে গেলাম বাবার।

—দ্যাখ তো!

ঠিক কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, কি দেখব বাবা?

—বাড়িটা দ্যাখ। ঠিক এতদিনে এটা মানুষের ঘরবাড়ি মনে হচ্ছে না? থাকার ঘর, খাবার ঘর, ঠাকুর ঘর, গোয়াল ঘর—সব মিলে মানুষের ঘরবাড়ি।

আমি বললাম, হ্যাঁ বাবা, সত্যি মানুষের ঘরবাড়ি।

—তোর মা বোঝে না। রাইমণিকে এনে ভাল করিনি?

—খুব ভাল হয়েছে।

—রাইমণি না থাকলে বাড়িটা ঠিক বাড়ি মনে হত না। দুধ না দেয় গোবরটা তো পাওয়া যাবে। বামুনের বাড়ি গোবর ছাড়া চলে!

—দুধও দেবে বাবা।

বাবাকে আর কি বলে সুখী করব বুঝতে পারলাম না। অন্ধকারে পিতাপুত্র আমাদের এতদিনের গড়ে ওঠা আবাস দেখছিলাম। সত্যি ধীরে ধীরে রাইমণির প্রতি ঠিক অন্য সবের মতো আমারও মায়া

পড়ে যাচ্ছে। রাইমণি অন্ধকারে ঘাস চিবুচ্ছিল—তার শব্দ, এবং দূরে ব্যারেক বাড়িতে বিউগিল বাজছে। গাছপালার ভেতর মানুষের ছোট্ট একটা ঘরবাড়ি ক্রমে গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল। জোনাকির আলোতে বাবার মুখে অস্পষ্ট সুখের আভাস। গাছপালা ঘরবাড়িটাতে সতর্ক প্রহরীর মতো বড় হয়ে উঠছে।

বাবা বাড়ির দিকে একসময় যেতে যেতে শুধু বললেন, বেঁচে থাকার জন্য মানুষের আর কি লাগে।

—